বিক্রয় কেন্দ্র : বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
২১১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

শাখা : অশোক রাজপথ, পাটনা-৪
" ৪৪, জনস্টনগঞ্জ, এলাহাবাদ-৩

অক্টোবর, ১৯৫৭

শ্রীদীপঙ্কর বসু কর্তৃক জে. এন. বসু এ্যাণ্ড কোং ৮০।৬, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত আর. রায় কর্তৃক গুড্ কোম্পানি (প্রিণ্টকো) ১৫ ডিক্সন লেন, কলিকাতা-১৪ হইতে মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

শতবার্ষিকী বৎসরে প্রকাশিত লেখকের 'রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার' নামে বইটি গুণগ্রাহী ব্যক্তিদের কাছে আশাতীত সমাদর লাভ করে। তার ফলে নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-মানস অধ্যয়নের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ লাভ করি। আগের বইটি স্বল্প সময়ে লিখিত হওয়াতে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা ছিল। বর্তমান পুস্তকে অনেক বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন যথাসম্ভব তাঁর নিজের কথাতে প্রকাশের চেষ্টা করেছি। তাই রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। উদ্ধৃতি দেওয়ার সময় কালগত ধারাবাহিকতা রক্ষার বদলে ভাবগত ধারাবাহিকতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান বইটি লেখার কাজে যাঁদের কাছে উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের মধ্যে শ্রীজানকীনাথ বসুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। আর কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীমতী শেফালি বিশ্বাস ও স্নেহলতা মুখোপাধ্যায়কে। তাঁরা রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ড প্রয়োজন মত ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং নিজেদের রবীন্দ্র-অনুরাগিতার পরিচয় দিয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

= সূচী =

॥ ১ ॥

রবীন্দ্র অধ্যয়নের নূতন দৃষ্টিকোণ

অসামান্য রবীন্দ্রপ্রতিভা; বহুমুখী তার সৃষ্টি এবং বহুবিচিত্র তার অভিব্যক্তি। সেই সৃষ্টির বিশাল ভাণ্ডারের বিভিন্ন দিক নিয়ে এ পর্যন্ত নানা জনে আলোচনা করেছেন। তাঁরা প্রধানতঃ নিজের নিজের রুচি অনুযায়ী এক একটি দিককে বেছে নিয়ে তুলে ধরেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সামগ্রিক ভাবে বোঝার ও বিচারের চেষ্টা এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয় নি। কাজটি অবশ্য কঠিন। তার জন্য চাই সহিষ্ণু একনিষ্ঠ এবং সমবেত প্রচেষ্টা। আর তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন অধ্যয়নের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নির্ধারণ করা। তার মত বিরাট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অবদানকে সমগ্র ও পরিপূর্ণভাবে বোঝার জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। বিচ্ছিন্ন আলোচনার দ্বারা যেমন পূর্ণাঙ্গ ধারণা হতে পারে না তেমনি তাতে নানা রকমের মনগড়া সিদ্ধান্ত, বিভ্রান্তি ও বিকৃতির অবকাশ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের সুমহান উত্তরাধিকারের সঠিক মূল্যায়নের জন্য তাঁর সুবিশাল সৃষ্টির পিছনে বিরাজমান মূলসুরটিকে বোঝার উপরই সর্বপ্রধান গুরুত্ব দিতে হবে। নিজ সৃষ্টির মূল্যবিচারের জন্য তিনি স্বয়ং এই পদ্ধতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধ সঙ্কলনে 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতামত' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি নিজ রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলে গেছেন সেগুলি সমগ্রভাবে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কেই প্রযোজ্য।

"বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি। যেহেতু বাক্যরচনা করা আমার স্বভাব সেইজন্যে যখন যা মনে এসেছে তখনি তা প্রকাশ করেছি। রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে, প্রয়োজনের সঙ্গে সেই সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত। যেমন একথা বলা চলে না যে, ব্রাহ্মণ-আদি

চারিবর্ণ সৃষ্টির আদিকালেই ব্রহ্মার মুখ থেকে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে, যেমন স্বীকার করতেই হবে আর্যজাতির সমাজে বর্ণভেদের প্রথা কালে কালে নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণত, তেমনি করেই অন্তত আমার সম্বন্ধে জানা চাই যে রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয় নি। জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে। সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোন্‌টা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত, সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।" (রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মতামত শীর্ষক প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৩৬৯-৩৭০ পৃঃ)।

কবি যাকে বলেছেন ঐতিহাসিক ভাবে দেখা, অর্থাৎ তাঁর বিভিন্ন রচনাকে রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, সে কাজটি অত্যন্ত বিরাট। তাতে হাত দেওয়া বিশেষ সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। অবশ্য কবি-জীবনীকার শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় তার একটি নির্ভরযোগ্য পটভূমি রচনা করেছেন। কবি যাকে বলেছেন ঐক্যসূত্র, যে জিনিসটি তৎসাময়িকতার সীমাকে অতিক্রম করে প্রবহমান, সেই জিনিসটিকে বোঝার প্রচেষ্টা করা হবে এই বইতে। অবশ্য তার পশ্চাৎপট হিসাবে কিছুপরিমাণে ঐতিহাসিকভাবে বিচারেরও প্রয়োজন হবে।

বস্তুত যে কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের কৃতীকে বিচারের জন্য দুইটি বিষয়ের উপর নজর দিতে হয়। প্রথমত দেখতে হয় যে যুগচেতনা কি ভাবে তাঁর মানসে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তার প্রেরণায় তিনি কি ভাবে সমসাময়িক যুগকে প্রভাবিত করেছেন। দ্বিতীয়ত, সেই প্রভাবের মধ্যে প্রবহমান বা গতিশীল প্রাণবস্তুটি কি এবং কি ভাবে তা উত্তরোত্তর বিকশিত হয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সংক্ষেপে এই জিনিসটিকেই বলা হয়েছে মূলসুর। যাঁরা সামাজিক প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অধ্যয়ন করতে ইচ্ছুক তাঁদের পক্ষে ঐ মূলসুরটিকে বোঝার চেষ্টা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেন, সে কথা একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রবীন্দ্রমানসে দুইটি স্বতন্ত্র বা আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র ধারার অস্তিত্ব দেখতে

পাওয়া যায়। একদিকে দেখা যায় ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যঘন অনুভূতি তথা উপলব্ধির সন্ধান। অপরদিকে পাওয়া যায় বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সচেতন এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী দৃষ্টির অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপারেও ঐ দুই ধারার অস্তিত্ব দুই প্রতিপক্ষের আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। একটি মতের প্রবক্তারা প্রথম দিকটিকেই প্রধান বলে প্রতিপন্ন করতে চান। তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের রচনার, বিশেষতঃ গান ও কবিতাগুলির অধিকাংশেই ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির সুর ঝঙ্কৃত। বর্তমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত অভিজাত বিদগ্ধ মহলে এই ধারা বা প্রবৃত্তিটিই একচ্ছত্র আসন দখল করে বসে আছে বলা চলে। তেমনি অপর মতের প্রবক্তারা কবির ছোটগল্প, উপন্যাস, বহু নাটক এবং বিশেষ করে তাঁর বিশাল প্রবন্ধ-সাহিত্য থেকে দ্বিতীয় দিকটির অভ্রান্ত স্বাক্ষর লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরেন। কবির চিন্তার পরিণতির ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা তাঁরা নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে বহু অকাট্য প্রমাণ, তথ্য ইত্যাদি উপস্থিত করে থাকেন।

যাঁরা কবির অধ্যাত্মবাদী দিকটিকেই প্রধান বলে মনে করেন তাঁরা যে সেইটিকেই কবিপ্রতিভার মূলস্বরূপে প্রমাণের জন্য সচেষ্ট হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! এমন কি, কবির যে সন্দেহাতীত মানবপ্রেমকে স্বীকার না করে কারুরই উপায় নেই, তাকেও এঁরা হয় গৌণ বিবেচনা করেন নতুবা এক বিমূর্ত প্রায়-রহস্যবাদী জিনিসরূপে প্রতিপন্ন করতে চান। মোটের উপর এঁদের বিশ্লেষণে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূলসুরটি সাধারণ মানুষের জীবন, হৃদয় এবং উপলব্ধির নাগালের বাইরে এক রহস্যময় আকাশচারী বস্তুতে পরিণত হয়। মনে হয় যেন সে জিনিসের সাথে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও সংগ্রামী সঙ্কল্পের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। যদিও এযাবৎ রবীন্দ্র-অধ্যয়ন বা ভাষ্যের প্রবাহ প্রধানত ঐ খাতেই বয়ে এসেছে তবু তার দুই একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমও আছে। বিশেষত শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় অনেকটা বস্তুনিষ্ঠভাবেই রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশের ধারাকে চিত্রিত করেছেন।

কিন্তু যাঁরা সামাজিক প্রগতির দৃষ্টিকোণ থেকে কবির উত্তরাধিকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁদের কাজে কতকগুলি ত্রুটি এবং অভাব রয়ে গেছে। তাঁরা সাধারণত কবির বিভিন্ন কৃতীকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনের পক্ষে উপযোগী অংশগুলিকে তুলে ধরেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদী দিকটি নিয়ে আলোচনার বদলে তাকে বরং পরিহার করে চলেন। অথবা

বড়জোর সেই দিকটিকে কবি-মানসের স্ব-বিরোধের অভিব্যক্তি বলে মন্তব্যের দ্বারা তার উপরে যবনিকা টেনে দিতে চান। অথচ ঐ দিকটিকে এড়িয়ে গেলে কখনও সামগ্রিক অধ্যয়ন হতে পারে না। তাতে শুধু কবি-মানসের একটি আংশিক চিত্র ফুটে ওঠে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে কবি-প্রতিভা এবং তার উত্তরাধিকারের পূর্ণাঙ্গ বিচার তথা পরিপূর্ণ মূল্যায়ণ হওয়া সম্ভব নয়।

কবি-মানসের উপরোক্ত দুইটি দিক স্বতন্ত্র এবং আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেও ত' একই ব্যক্তিমানসেয় দুই দিক। তারা পরস্পরবিরোধী হলেও পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাদের মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র এবং একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং যাঁরা রবীন্দ্রনাথের অতলস্পর্শী মানবপ্রেম এবং তার অতি-বাস্তব, বলিষ্ঠ সংগ্রামী দিকটিকে প্রধান বলে মনে করেন তাঁবাও অপবদিকটির আলোচনা এড়িয়ে যেতে পারেন না। উভয়দিককে সামগ্রিকভাবে বিচারের সাহায্যেই শুধু সেই ঐক্যসূত্র বা মূলসুরটিকে বোঝা এবং জানা সম্ভব।

লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমই তাঁর সমগ্র সৃষ্টি এবং জীবনদর্শনের মূলসুর। কবির জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একাত্মতার অনুভূতি এবং মানুষের প্রতি ভালবাসা এই দুইটি, বা প্রকৃত প্রস্তাবে একটিই, প্রবৃত্তি সমস্ত সৃষ্টির মর্মকোষ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে। গোড়ার দিকে সেই মানবপ্রেম ছিল অধ্যাত্মবাদের রংয়ে রঙীন। তারপর ক্রমশঃ জীবনের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তা উত্তরোত্তর বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। প্রথম জীবনে তিনি যে অন্তরসত্যের সন্ধান করেছিলেন তা ক্রমে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে মানবসত্যরূপে। কবি পরবর্তী জীবনে পাশ্চাত্যের যুক্তিধর্মী মানবতাবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই যুক্তিবাদী মানবতাবাদ তাঁর সামনে নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করে ধরেছে। তার আলোকে তিনি ক্রমেই অধিকতর দৃঢতার সাথে সব রকম অন্যায় অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন মানুষের অধিকারের স্বপক্ষে সংগ্রামের সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের ভাবধারাকে তিনি অন্ধভাবে অনুকরণ করেন নি। নিজ দেশের মানবতাবাদী ঐতিহ্যের সাথে মিলিয়েই তাকে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন।

একথাও দিবালোকের মত স্পষ্ট যে কবির আধ্যাত্মিকতা তাঁকে কখনই

বাস্তব তথা জীবনের প্রতি বিমুখ করতে পারে নি। অধ্যাত্মবাদের প্রভাবে তাঁর সম্মুখে অনেক সময় দ্বিধা ও পিছুটান দেখা দিয়েছে কিন্তু তবু তাঁকে সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে নিতে সমর্থ হয় নি। বরং দেখা গেছে যে সেই সংগ্রামের প্রেরণায় তিনি সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন। এমন কি নিজের সামাজিক পরিবেশজাত বহু ধারণা ও দীর্ঘদিন সঞ্চিত সংস্কারকে বর্জন করতে কুণ্ঠিত হন নি। তিনি অগ্রসর হয়ে চলেছেন মানুষের প্রতি ভালবাসা এবং সত্যনিষ্ঠাকে পাথেয় করে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সেই চলা অব্যাহত থেকেছে। অধ্যাত্মবাদ বলতে সাধারণত আমরা যা বুঝে থাকি তার দ্বারা উপরোক্ত প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা চলে না। সুতরাং কবির আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মবোধের চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কোন কোন সমালোচককে বলতে শোনা গেছে যে রবীন্দ্রনাথের মানসের অধ্যাত্মবাদী দিকটি প্রাচ্য তথা ভারতীয় প্রভাবের এবং যুক্তিধর্মী মানবতাবাদী দিকটি পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। যাঁরা এই ধরণের মত পোষণ করেন তাঁদের কেউ কেউ আবার নিজেকে সামাজিক প্রগতির সমর্থক বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। সেইজন্য এখানে ঐ বক্তব্যটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করার দরকার আছে।

উক্ত মতটি ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর ত' বটেই। উপরন্তু তা আদৌ প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত হয় না। প্রথমত, প্রাচ্য তথা ভারতীয় প্রভাবের ফলটি হবে পুরোপুরি অধ্যাত্মবাদী ও রক্ষণশীল আর পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল হবে সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল—এরূপ সিদ্ধান্তটিই অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক। এক সময়ে ইউরোপীয় রোম্যান্টিক সাহিত্যে, বিশেষত যে সব সাহিত্যিকের কাছে রোম্যান্টিসিজম্ ছিল বাস্তবের ক্ষেত্র থেকে পলায়নের মতবাদ তাদের রচনায়, ঐ প্রবণতা দেখা যেত। প্রাচ্য বলতেই তাঁরা বুঝতেন 'দি মিস্টিক ইস্ট' (The Mystic East)। অন্যপক্ষে আমাদের দেশে সনাতনপন্থীরা ভারত তথা প্রাচ্যকে অধ্যাত্মবাদী এবং পাশ্চাত্যকে বস্তুবাদী বলে ঢালাও ভাবে বর্ণনা করে থাকেন। যদি প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানের অনুগামীদের মধ্যে কারুর মনে উপরোক্ত দুই প্রবণতার জের অবচেতনভাবেও বজায় থাকে, তাকে বিসর্জন দিতে হবে। প্রত্যেক দেশেরই চিন্তার ইতিহাসে অধ্যাত্মবাদী এবং বস্তুবাদী ধারার অস্তিত্ব প্রায় গোড়ার দিক থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানীরা সেই ধারা দুটির উৎপত্তি এবং বিকাশের প্রক্রিয়াকে বিচার

করে দেখে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে। এজন্য শুধু সাধারণভাবে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিকে বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়, জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশের ইতিহাসকে বিশেষ পটভূমিরূপে গ্রহণ করতে হবে। সেই ইতিহাসে অধ্যাত্ম তথা ভাববাদী এবং বস্তুবাদী চিন্তাধারা যথাক্রমে কি নির্দিষ্ট ভূমিকা পূরণ করেছে তাকে অধ্যয়ন করে দেখতে হবে বিশেষ মনোযোগের সাথে। অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ সমাজে শোষকশ্রেণীর হাতে অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শোষকশ্রেণীর সেই ভূমিকার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই সামাজিক প্রগতির সমর্থকদের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাই বলে, মানুষের চিন্তার বিকাশের ইতিহাসে ভাববাদ তথা অধ্যাত্মবাদ সর্ব সময়ে এবং সর্বক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলা ঠিক হবে না। এরূপ ধারণা ইতিহাসের সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণের দ্বারা সমর্থিত হয় না। বরং দেখা যায় যে অনেক সময় সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের বিদ্রোহ প্রথমে অধ্যাত্মবাদী আবরণের মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। ভাববাদী দর্শনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই যুগে যুগে শোষকশ্রেণী তাকে জনগণের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করার কাজে ব্যবহার করেছে। কিন্তু তা থেকে কোন একপেশে ও যান্ত্রিক সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। কেননা তা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের কাজে গুরুতর ত্রুটির জন্ম দিতে বাধ্য। মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক যুগে বস্তুবাদী দর্শণের দুর্বলতাকেও ধনিকশ্রেণী ঠিক একই ভাবে কাজে লাগিয়েছে। সুতরাং সামাজিক-ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটে ভাববাদী চিন্তাধারার অবদান এবং দুর্বলতা দুটিকেই সামগ্রিক ভাবে বিচার করে দেখা—এইটিই হল সঠিক পদ্ধতি। তাহলে সেই চিন্তাধারার বিভিন্ন উপাদানগুলির যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞান এইরূপ মূল্যায়ণের দ্বারাই সমস্ত দেশের এবং সমস্ত যুগের মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকে আপন করে নেয়; অতীত ঐতিহ্যের মধ্যে যা জীবন্ত ও প্রগতিশীল তাকে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যায় আর যা মৃত, যা অগ্রগতির পথের বাধাস্বরূপ তাকে বর্জন করে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন বিচার করে দেখা প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি-মানসের উপর বিদেশের প্রগতিশীল ভাবধারা কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করে? ব্যক্তি-মানসের প্রবণতা প্রভাবিত হয় প্রধানত তাঁর সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিবেশের দ্বারা। বিদেশের কোন্ জিনিসটির দিকে তিনি আকৃষ্ট

হবেন তা মূলত এরই উপর নির্ভর করে। স্বদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ব্যক্তি-মানসের পটভূমির একটি প্রধান বা প্রধানতম উপাদান। যিনি সেই সত্য সম্বন্ধে সচেতনভাবে এবং তার শ্রেষ্ঠ ও জীবন্ত দিকগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, বিদেশের প্রগতিশীল ভাবধারাকে গ্রহণ করেন তিনিই সেই ভাবধারার অন্তর্নিহিত সম্পদকে সত্যকার অর্থে আপন করে নিতে সমর্থ হন। খাদ্য যেমন ভাবে শরীরে গৃহীত এবং পরিপক্ক হওয়ার ফলে শক্তিবৃদ্ধি করে, তেমনিভাবে বিদেশের কাছে থেকে নেওয়া বস্তুকে গ্রহণের দ্বারাই সফল ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া যেতে পারে নিজীকরণ (assimilation); অর্থাৎ নিজস্ব সম্পদের ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে অপরের কাছে থেকে নেওয়া বস্তুর সদ্ব্যবহার করা। এর বিপরীত প্রক্রিয়া হল অনুকরণ। নিছক অনুকরণের দ্বারা সত্যকার অর্থে গ্রহণ তথা পরিপাকের ক্রিয়া সাফল্যলাভ করে না। নিছক অনুকরণ গৃহীতার নিঃস্বতা ও ব্যর্থতার পরিচায়ক হয়ে থাকে। যে সব ক্ষেত্রে নিজীকরণের প্রক্রিয়াটি হয় দুর্বল সেখানে দেখা দেয় দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ বিদেশের প্রগতিশীল ভাবধারা একান্তই পোষাকী হয়ে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে ব্যাপারে তা কাজে লাগে না এবং স্বদেশের জনগণের হিতসাধনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে অসমর্থ হয়।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে দ্বিধাবিভক্ত বলতে কেউ সাহস করবেন না। তাঁর মননের দ্বৈতচরিত্র সত্ত্বেও তা একটি সমগ্র এবং সমন্বিত বিরাট ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব কবির মানবতাবাদকে আগুনে পুড়িয়ে পবিণত করেছে নিকষিত হেমে। তাঁর চরিত্রে ঘটেছে একদিকে যুক্তি ও জ্ঞান, অন্যদিকে অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ, উভয়ের এক অপূর্ব সমন্বয়। তিনি বিদেশের কাছে যে ভাবসম্পদ পেয়েছেন তাকে পোষাকীভাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মানসক্ষেত্র ভারতের নিজস্ব চিন্তাপ্রবাহের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যের রসে অভিষিক্ত এবং উর্বরতার আশীর্বাদে ধন্য হয়ে মহান্ সৃষ্টির সম্ভাবনায় প্রস্তুত হচ্ছিল। পাশ্চাত্যের যুক্তিধর্মী মানবতাবাদকে তিনি সেই ক্ষেত্রের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং কবি মানসের উৎস সন্ধানের প্রশ্নটিই সর্বাধিক প্রাধান্য অর্জন করে। সেই উৎস হল উপনিষদীয় চিন্তার প্রভাব। রবীন্দ্রমানসের বিকাশের প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিক ভাবে

আলোচনা করলে দেখা যায় যে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সাথে পরিচয়ের বহুপূর্বে তাঁর জীবনদর্শনের মূলচরিত্র এবং মননবৈশিষ্ট্য স্বকীয় রূপরেখায় অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। তার উপরে উপনিষদীয় চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট। বাল্যকাল থেকে এই প্রভাবের ক্রিয়া শুরু। 'আত্ম-পরিচয়' গ্রন্থে তিনি বলেছেন

"আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই, প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।" (আত্ম-পরিচয়, বিশ্বভারতী প্রকাশিত ১৯১০ সালের সংস্করণ, পৃঃ ৭৮)

ঐ বইতেই কবি বলেছেন "আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তরদৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে।" (ঐ, পৃঃ ১০৫)

অতি অল্প বয়সে কবির যখন উপনয়ন হয়, তখন তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের সাথে পরিচিত হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বারো বৎসর। সেই পরিচয়ের ফল সম্বন্ধে উত্তরজীবনে তিনি লেখেন

"এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভুর্, ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব; বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।

এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি, তিনি বিশ্বাত্মাতে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। (মানুষের ধর্ম গ্রন্থের মানব সত্য নামক পরিশিষ্ট, বিশ্বভারতী প্রকাশিত ১৯১০ সালের সংস্করণ, পৃঃ ৭৭;)

উপনিষদের বাণী জীবনের শেষ পর্যন্ত কবিকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তার নিদর্শণও রয়েছে উক্ত 'আত্ম-পরিচয়' বইটিতেই। "আজ সত্তর বছর বয়সে সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি যাঁরা আমাকে জানবার কিছুমাত্র চেষ্টা করেছেন এতদিনে অন্তত

তাঁরা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণজগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাতে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামল পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্ররসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনোদিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠেছে—বলে উঠেছে 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ'—যাতে কোনো প্রয়োজন নেই তাও আনন্দের টানে টানবে এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে, যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।" (ঐ, ৯২-৯৩ পৃঃ)

রবীন্দ্রমানসের দুই ধারার অস্তিত্ব এই উদ্ধৃতিটির মধ্যেই সুপরিস্ফুট। প্রাচীনপন্থীরা এর মধ্যে দেখেন শুধু অধ্যাত্মবাদী দিকটিকে অর্থাৎ বিরাট সত্তার প্রতি কবির প্রণতিকে এবং অনাদিকালের অনাহত বাণীকে সাড়া দেওয়ার কথাটিকেই তাঁরা বড় করে দেখেন। আর প্রগতিপন্থীরা হয়ত ঐটুকু দেখে সমগ্র বক্তব্যটিকে এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু এর অপর দিকটি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই পৃথিবীকে আকাশদূতগুলি যে আদর জানায় প্রতিনিয়ত, কবি তাকে তুচ্ছ মনে করেন নি, বরং অক্লান্ত উৎসাহে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। বিরাট সত্তার স্পর্শ তিনি খুঁজেছেন নিজ অনুভূতিতে কিন্তু তাকে খুঁজেছেন সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের মূলগত ঐক্যতত্ত্ব রূপে। বিশ্বভুবনের সাথে তাঁর একাত্মতাবোধের মূলে রয়েছে অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু সেই একাত্মতাবোধই প্রথম থেকে তাঁকে মানুষের বৃহৎ জীবনপ্রবাহের দিকে আকর্ষণ করেছে।

'কবি-কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের রচনা। তার সময়কাল ইংরেজী ১৮৭৮ সাল। কবির বয়স সতেরো। সে সৃষ্টি অপরিণত মনের এবং উত্তরজীবনে তিনি তার দোষত্রুটির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবু সেই রচনা থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর চিন্তা কোন্ দিগন্ত অভিমুখে যাত্রা করেছে। ঐ বইতে পাওয়া যায় বিশ্বপ্রেমের কথা। যদিও তা খুবই অস্পষ্ট এবং বিমূর্ত্ত তবু তার মধ্যেই রয়েছে ভবিষ্যতের নির্ভুল ঈঙ্গিত। 'কবি-কাহিনী' লেখার পাঁচ বৎসর পরে রচিত হয় 'প্রভাত-সঙ্গীত'। যা ছিল এর আগে ছায়াময় ঈঙ্গিতমাত্র, এখানে এসে তাতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। এখানে শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একাত্মতাবোধই নয়, মানুষের জগতের সাথে হৃদয়ের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক উপলব্ধির স্পন্দন সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়। 'জীবন-স্মৃতি'তে কবি নিজের 'প্রভাত-সঙ্গীত' রচনাকালীন মনোভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন

"সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন; আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সমস্তই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।

* * * *

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়ে মুটেমজুর যে-কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গ-লীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর এক যুবকের কাঁধে

হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসিয়া ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।

সামান্য কিছু কাজ করিবার সময়ে মানুষের অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে যে গতি-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় তাহা আগে কখনো লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই—এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীতে আমাকে মুগ্ধ করিল। এ-সমস্তকে আমি স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতাম না, একটা সমষ্টিকে দেখিতাম। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সর্বত্রই নানা লোকালয়ে, নানা কাজে নানা আবশ্যকে কোটি কোটি মানব চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে—সেই ধরণীব্যাপী সমগ্র মানবের দেহচাঞ্চল্যকে সুবৃহৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহাসৌন্দর্যনৃত্যের আভাস পাইতাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, ইহাদের মধ্যে যে একটা অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—

ইহা কবি কল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।"

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃঃ ১০১-১০২)

কবি-কাহিনী রচনার কাছাকাছি সময়েই বালক কবি স্বাদেশিকতার উদ্দীপনায় সৃষ্টি করেন হিন্দুমেলার বার্ষিক উৎসবে গীত সেই সুপ্রসিদ্ধ গানটি

"এক সূত্রে গাঁথিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সপিয়াছি সহস্র জীবন।"

এখানে যা শোনা যায় তাকে ভোরের পাখির কাকলির সাথে তুলনা করা চলে। তার মধ্যে শোনা যায় একটা বিমূর্ত হৃদয়াবেগের তরঙ্গধ্বনি। তরু-পাখি কুলায় ছেড়ে যে দিগন্তের অভিমুখে যাত্রায় উদ্যত তার ঈশারা এর মধ্যেই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

শেষ বয়সে তিনি প্রথম জীবনের সেই চেতনার জাগরণ সম্বন্ধে বলেছেন।

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।"

এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমার মধ্যে প্রবেশ করল। সেদিন কারার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল বিচিত্র লীলার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে, অন্তরের মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা। ('মানুষের ধর্ম' নামক বইয়ের 'মানবসত্য' নামক পরিশিষ্ট, বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ১৯১০ সালের সংস্করণ, ৮২ পৃঃ)।

এরই দু-চারদিন পরে লেখা 'প্রভাত-উৎসব'। সেখানে তিনি যে হৃদয়ের সাথে জগতের কোলাকুলির অনুভূতি লাভ করেছেন শুধু তাই নয়

ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন

"এই তো সমস্তই মানুষের হৃদয়ের তরঙ্গলীলা। মানুষের মধ্যে স্নেহ প্রেম ভক্তির যে সম্বন্ধ সেটা তো আছেই। তাকে বিশেষ করে দেখা, বড় ভূমিকার মধ্যে দেখা, যার মধ্যে সে তার একটা ঐক্য একটা তাৎপর্য লাভ করে। সেদিন যে দুজন মুটের কথা বলেছি তাদের মধ্যে যে আনন্দ দেখলুম, সে সখ্যের আনন্দ অর্থাৎ এমন কিছুর যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। সেইটে দেখেই খুশি হয়েছিলুম। আরও খুশি হয়েছিলুম এইজন্যে যে, যাদের মধ্যে ঐ আনন্দটা দেখলুম তাদের বরাবর চোখে পড়ে না, তাদের অকিঞ্চিৎকর বলেই দেখে এসেছি। যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী

প্রকাশ দেখলুম অমনি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম। মানব সম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন। সে দেখা বালকের কাঁচা লেখায় আঁকু বাঁকু করে নিজেকে প্রকাশ করেছে কোনো রকমে, পরিস্ফুট হয়নি। সে সময়ে আভাসে যা অনুভব করেছি তাই লিখেছি। আমি যে যা-খুশি গেয়েছি তা নয়। এ গান দু'দণ্ডের নয়, এর অবসান নেই। এর একটা ধারাবাহিকতা আছে। এর অনুবৃত্তি আছে মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গে সকল মানুষের যোগ আছে। গান থামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।" (ঐ, ৮৩-৮৪ পৃঃ)

কবি সেদিন বুঝতে শুরু করেছিলেন মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যে আনন্দের রসটিকে। সকলের মধ্যেকার এই আনন্দ-রসকে নিয়েই হয় মহারসের প্রকাশ। সেদিন তিনি তাকে পেয়েছিলেন রসের খণ্ড খণ্ড প্রকাশের মধ্যে। সেই অনুভূতিকে প্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তখন তিনি যা বলেছেন তা অসম্পূর্ণ, তাকে ভালরকমভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। কিন্তু বৃহত্তর মানব-ঐক্যের অভিমুখে যে যাত্রা সেদিন শুরু হল তা এগিয়ে চলেছে অশ্রান্ত গতিতে, কখনও পথ হারায়নি এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে বিশ্বমানব হৃদয়ের সাগর সঙ্গমে। যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল, তা বেগবতী নদীর আকার ধারণ করে মিলেছে গিয়ে মহাসাগরে। সেই বাণীই রবীন্দ্রনাথ রেখে গিয়েছেন 'আত্ম-পরিচয়' এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। "আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহা-মানবের মধ্যে যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন সেই নরদেবতা, তাঁরই বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি। (রচনাবলী, দশম খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)

উপনিষদের প্রভাব যেভাবে কবির চিন্তার উন্মেষ থেকে শুরু করে সারা-জীবনের কৃতীকে প্রভাবিত করেছে সেই বিষয়টিকে সামাজিক প্রগতির দৃষ্টি-কোণ থেকে অধ্যয়ন করা বিশেষ প্রয়োজন, এমন কি অপরিহার্য বলা অন্যায়

হবে না। এই অধ্যয়নের সময় উপনিষদকে আমরা দেখবো কবিরই চোখ দিয়ে। ফলে উপনিষদীয় চিন্তার উপরে সম্পূর্ণ নূতন আলোকসম্পাত হবে। কবিমানসের বিকাশ এবং পরিণতির প্রক্রিয়া সামগ্রিকরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আর উপনিষদীয় চিন্তার মধ্যে যে মানবতাবাদী ধারার অস্তিত্ব রয়েছে সেটি আমাদের দৃষ্টির সামনে আত্ম প্রকাশ করবে।

শেষের বক্তব্যটি হয়ত অনেকের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। যাঁদের উপনিষদীয় অদ্বৈততত্ত্বের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তাঁদের কাছ থেকে হয়ত উক্ত বক্তব্যের জন্য বিরূপ মন্তব্যও শুনতে হতে পারে। কেননা সাধারণত উপনিষদীয় চিন্তা বলতে মায়াবাদ এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর এক রহস্যময় সত্তার সন্ধানের কথাই মনে আসে। উপনিষদীয় ভাবধারার প্রবক্তারূপে যাঁরা বহুল পরিচিত তাঁরাও সর্বসাধারণের মনে অনুরূপ ধারণাকে বদ্ধমূল করে দিতে সচেষ্ট। তার কারণ, উপনিষদের শঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্যই দেশের শিক্ষিত সমাজে সমধিক পরিচিত। কিন্তু শঙ্কর ভাষ্যই যে উপনিষদের একমাত্র ব্যাখ্যা নয় সে সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। এখানে সে আলোচনার অবতারণা না করেও একটি কথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। উপনিষদের শিক্ষাকে ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে নানা মহল থেকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার এবং ব্যবহারের প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই বিষয়ে প্রগতিশীল সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে আলোচনা তথা অনুসন্ধানের বিশেষ কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত হয় নি। অথচ ভারতীয় দর্শন এবং চিন্তার ইতিহাসকে সম্যকভাবে বোঝার পক্ষে এ কাজটি অপরিহার্য।

রবীন্দ্রমানসে উপনিষদের প্রভাব তাঁকে জগতকে অস্বীকার করতে শেখায় নি। অদ্বৈততত্ত্ব তাঁকে মায়াবাদের পথে চালিত করার বদলে বরং জগতকে আরো গভীরভাবে ভালবাসতে শিখিয়েছে। উপনিষদীয় চিন্তার মানবতাবাদী দিকটিই তাঁর মনোজগতে প্রধান্য লাভ করেছে। ঐক্যতত্ত্ব কবির মননে এবং সৃষ্টিতে অপূর্ব ঐকতানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবির সুদীর্ঘকালব্যাপী সত্য সন্ধানের প্রবাহে জ্ঞানের নূতন নূতন দিক এসে মিলেছে সেই মূলধারাটিরই সাথে।

রবীন্দ্রমানসের পরিণতির প্রক্রিয়াকে উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়নের

কাজের দুটি অঙ্গ আছে। প্রথমত দেখা দরকার যে উপনিষদীয় তত্ত্ব কিভাবে কবির চিত্তে দুই বিপরীত প্রবৃত্তির জন্ম দিয়েছে এবং সেই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে যে দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছে তার জয়ের সম্ভাবনার বীজ ঐ তত্ত্বের মধ্যে কোথায় নিহিত আছে। মোট কথা, উপনিষদীয় তত্ত্বের দ্বৈত প্রকৃতির পর্যালোচনা এবং কবি নিজে কিভাবে সেই দ্বন্দ্বের সমাধান করেছেন তাই দেখা হবে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় করণীয়টি হল, যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে কবির মনোজগতে জাগরণ শুরু এবং তার অগ্রগতি হয়েছে, সেইটির বিশ্লেষণ। তবেই বোঝা যাবে যে কবির চিত্তে যুগমানসের প্রতিফলন কিভাবে হয়েছে এবং কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে কি কি ধরণের সংঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়ে এসেছেন। এইভাবে তাঁর সংগ্রামী অভিজ্ঞতার স্বরূপটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে।

॥ ২ ॥

উপনিষদ ও রবীন্দ্রমানস

কবিমানসে উপনিষদের প্রভাব এবং তার পরিণতি সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এবং প্রয়োজন দুইই আছে। প্রথমে দেখা যাক্ যে উপনিষদীয় শিক্ষার দ্বৈতপ্রকৃতি কি ভাবে কবির চিত্তে দুই বিপরীত প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। আত্ম-পরিচয় এর শেষের দিকে তিনি বলেছেন

"ঋষি কবি দেখতে পেয়েছিলেন কবির প্রকাশকে কবির দৃষ্টিতেই। সবুজের মালা-পরা এই অবির আর্বিভাবের এমন কোনো কারণ দেখানো যায় না যার অর্থ আছে প্রয়োজনে। বলা যায় না কেন খুশি করে দিলেন। এই খুশি সকল পাওনার উপরের পাওনা। এর উপরে জীবিকাপ্রয়াসী জন্তুর কোনো দাবি নেই। ঋষি কবি বলেছেন, বিশ্বস্রষ্টা তাঁর অর্ধেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নিখিল জগৎ। তারপরে ঋষি প্রশ্ন করেছেন, তদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ, তাঁর বাকি সেই অর্ধেক যায় কোন্ দিকে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর জানি। সৃষ্টি আছে প্রত্যক্ষ, এই সৃষ্টির একটি অতীত ক্ষেত্র আছে অপ্রত্যক্ষ। বস্তুপুঞ্জকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহা অবকাশ না থাকলে অনির্বচনীয়কে পেতুম কোন্‌খানে! সৃষ্টির উপরে অসৃষ্টের স্পর্শ নামে সেইখানেই, আকাশ থেকে পৃথিবীতে যেমন নামে আলোক। অত্যন্তকাছের সংস্রবে কাব্যকে পাইনে, কাব্য আছে রূপকে ধ্বনিকে পেরিয়ে যেখানে আছে স্রষ্টার সেই অর্ধেক যা বস্তুতে আবদ্ধ নয়। এই বিরাট অবাস্তবে ইন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রসখার ভাবের মিলন ঘটে। ব্যক্তের বীণাযন্ত্র আপন বাণী পাঠায় অব্যক্তে।" (রচনাবলী, দশমখণ্ড, ২২১ পৃঃ)

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এখানে প্রত্যক্ষ বস্তুপুঞ্জকে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু প্রত্যক্ষের অতীত এবং বস্তুপুঞ্জের উর্ধে অবস্থিত এক বিরাট অবাস্তব কেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' নামক প্রবন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কবি বলেছেন,

"এই জন্যই উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না। অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্যমনের অগোচর পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বাঙমনোগোচর ক্ষুদ্র করিয়া, খণ্ড করিয়া দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ, লাভ করিতে পারি না। আমরা ত' সংসারের সংকীর্ণতা-দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা-দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা-দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া আছি—আমরা জানি সংসারের স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি—সংসারের সমুদায় স্রোত ভয়াবহ—সকলেরই মধ্যে ভয়দুঃখ-ক্লেশ জরামৃত্যু-বিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে—অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই, তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? যাঁহাকে পাইলে শান্তিমত্যন্তমেতি, অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষৎ বলেন স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যঃ তিনি সংসার কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ, এবং অন্যঃ অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার কাল ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে ত' সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল—তবে ত তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি।

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমাস্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারিনা, সেইজন্য তাঁহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই, তাঁহারা উপনিষৎ কথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ,

আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা কহিতেছেন

যৎ বাচা নাভ্যূদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

যিনি বাক্য-দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান—এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান—এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে—যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃত লাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদবেদ নো ন বেদেতি বেদ চ।

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে—তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে।" (রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৬৩৫-৬৩৬ পৃঃ)

ইন্দ্রিয়াতীত রহস্য উপলব্ধির প্রবণতা উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে সুপরিস্ফুট। শুধু মাত্র ঐ বক্তব্যটুকুকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে মনে হবে যে ঐটিই উপনিষদীয় তত্ত্বের একমাত্র দিক এবং রবীন্দ্রনাথের মনে উক্ত প্রবণতাটিই প্রধান। কিন্তু উপনিষদ ব্রহ্ম প্রবন্ধেই কবি-মানসের অন্য দিকেরও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদেই যে জগৎ-স্বীকৃতির বলিষ্ঠ প্রকাশ রয়েছে সেই দিকটিকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন নিম্নরূপ ভাবে,

"য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে

উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ, জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্তস্বরূপ—অর্থাৎ এককথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এরকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সেকথা আলোচনা করতে চাইনে, কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্তস্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূর যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চজগত্যাং জগৎ। জগতে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে, এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।

যো দেবাঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোন বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান গম যব প্রভৃতি যে-সকল ওষধি কেবল কয়েকমাসের মতো পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্যসত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু এইটুকুকে জানা নয়; নমো নমঃ। তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, সর্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রের সেইও একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।"

(বিশ্ববোধ, শান্তিনিকেতন শীর্ষক প্রবন্ধমালা, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৩২১ পৃঃ)।

যে গায়ত্রীমন্ত্র বাল্যকালে কবিকে বিশ্বভুবনের সাথে একাত্মবোধে অনুপ্রাণিত করেছিল, পরিণত বয়সে এসে তাকে তিনি ব্যাখ্যা করেন আশ্রমের বালকদের জন্য।

"আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম,

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারদিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগতকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুণ আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করিব। গায়ত্রী মন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগ সাধন করে—এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব:

> যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
> য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল মনে

করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ।" (শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৮১৮-৮১৯ পৃঃ)।

এখানে বাস্তবজগতের স্বীকৃতি সত্ত্বেও অধ্যাত্মবাদী প্রবণতাই প্রধান, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপনিষদের প্রাচীনপন্থী প্রবক্তাগণ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনপন্থী ভাষ্যকারেরা জগৎ-স্বীকৃতির দিকটিকে নেহাৎ মামুলীভাবে উল্লেখ করেন আর গৌণ বলে প্রতিপন্ন করতে চান। সেইজন্যই এই সুপরিচিত বক্তব্যের মধ্যেকার বস্তুনিষ্ঠ দিকটির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কবি যখন অপ্রত্যক্ষের সন্ধানে ছুটতে চান তখন কি তিনি প্রত্যক্ষকে অবহেলা করেন? অব্যক্তের পিছনে ছোটার আগ্রহে কি ব্যক্তকে উপেক্ষা করেন? এরূপ ক্ষেত্রে সে বিপদের আশঙ্কা থাকে ঠিকই, বিশেষত কবি ও ভাবুকদের বেলায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন ব্যক্ত থেকে অব্যক্তের দিকে যেতে, ব্যক্তকে বা প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করে নয়। তিনি চেয়েছেন ব্যক্তের বীণাযন্ত্রে অব্যক্তের প্রতি বাণী পাঠাতে। বাহিরের সাথে অন্তরের যোগসাধনের উদ্দেশ্যে বাহিরকে মোটেই উপেক্ষা করেন নি। রবীন্দ্রমানসকে সমগ্রভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে তিনি অন্তর বা বাহির, ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনদিকেরই প্রতি একতরফা জোর দেওয়ার বদলে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে চেয়েছেন। এই সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টার মধ্য দিয়েই উপনিষদীয় ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা উজ্জ্বলতম রূপরেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে। গানে ও কবিতায় পাই তার অপূর্ব কাব্যময় অভিব্যক্তি এবং প্রবন্ধ, ডায়রি ও পত্রাবলীতে পাওয়া যায় কাব্যগন্ধী ভাষায় দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা। 'জাপান যাত্রী'তে দেখা যায়, কবি কূলহারা সমুদ্রের বুকে বসে দিনলিপি লিখে চলেছেন। চোখের সামনেকার দৃশ্যপটকে আশ্রয় করে মন উড়ে চলেছে বহুদূরে আর সেই চিন্তার ফসল রসস্নাত হয়ে লেখনীর মুখে উৎসারিত হচ্ছে। তাঁর চিন্তার মূলসূত্রকে বোঝার পক্ষে সেগুলি খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

"এই কয়দিন আকাশ ও সমুদ্রের দিকে চোখভরে দেখছি আর মনে হচ্ছে, অনন্তের রঙতো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্যন্ত

আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তারপরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর সীমার রাজ্য সেই পর্যন্ত; তার পরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুলছে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ পরে অভিসারে চলেছে—ওই কালোর দিকে, ওই অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্বস্ব করে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেড়িয়ে পড়েছে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা; পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড়বৃষ্টি—সমস্তকে অতিক্রম করে; বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেছে, সে কেবল ওই অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তের দিকে, 'আরো'র দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসারযাত্রা—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্‌দিকে চলে, ওদিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখতে পাওয়া যায় না! না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য তো নয়; কেননা ওই দিক থেকেই বাঁশির সুর আসছে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি সে তো বুদ্ধিমানের চলা, তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কুলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে-চলায় মরা-বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেছে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চলতে হয়; কোনো নজির মানতে গেলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে-যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ৎ আছে—সে বলছে ওই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাকছে। নইলে কি কেউ সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে।

যেদিক থেকে ওই মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজছে ওই দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ওই দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েছে। ওই কালোকে

দেখে মানুষ ভুলেছে।" (রচনাবলী, দশমখণ্ড, ৪৭৪—৪৭৫ পৃঃ)

শুধু এইটুকু দেখলে মনে হবে যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ঝোঁক অব্যক্ত এবং অসীমের দিকে। মনে হবে যে 'সীমার মাঝে অসীমের সুর' শুনে তিনি সীমা বা সসীমকে ভুলে গিয়েছেন। কিন্তু, বস্তুত তিনি তা করেন নি। ঐ 'জাপানযাত্রী' তেই পরমুহূর্তে তিনি লিখছেন,

"আবার উলটো দিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ওই কালো অনন্ত আসছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দমূর্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেইজন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে; অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে। ওই কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখতে পারেন না, কেন না এযে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখির পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে ধরা পড়ছে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের। —অব্যক্ত যে ব্যক্তের মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে ফিরে ফিরে পাচ্ছেন।

এই অব্যক্ত কেবলই যদি না-মাত্র শূণ্যমাত্র হতেন তাহলে প্রকাশের কোনো অর্থই থাকত না, তাহলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত তাহলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলই আরো-কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুলত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন। এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুলত্যাগ করে কেন। ওই দিকে শূন্য নয় বলেই, ওই দিকে সে পূর্ণকে অনুভব করে বলেই। সেইজন্যই উপনিষদ বলেছেন—ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে। আলোর মন ভুলেছে কালোয়. কালোর মন ভুলেছে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে তখন তার রূপটি একেবারে উলটে যায়। প্রকাশের একটা উলটোপিঠ আছে, সে হচ্ছে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো

জিনিস থাকা চাই—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্ছে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উলটো পিঠেই চোখ রাখে, বলে, সবই যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না; বলে, জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখছি এ-সমস্তই 'না'; তাহলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো করে, ভয়ংকর করে দেখে; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগুচ্ছে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করছে। আর অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু শুদ্ধকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে কিন্তু বস্তুত নেই; আর যিনি কেবলমাত্র আছেন তিনি স্থির, ওই প্রলয়রূপিনীর না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই; এরূপ যোগের অর্থ হচ্ছে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যে এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।" (ঐ ৪৯৫-৪৯৬ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু সে অদ্বৈত ব্যক্ত বা প্রত্যক্ষকে অস্বীকার বা বিনষ্ট করে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না। বৈচিত্র্যময় প্রকাশেই তার অস্তিত্ব। উপনিষদে বলা হয়েছে

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তি যোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।"

কবি সেই মন্ত্রের মর্মবাণীকে ভাষা দিয়ে বলেছেন,

"অমৃত—সে যে শুভ্র আলোর মতো পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেছে, অমৃতরসে তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এইজন্যে, অনেককে সত্য করে জানতে হলে সেই এককে সঙ্গে সঙ্গে জানতে হয়। গাছ থেকে যে-ডাল কাটা হয়েছে সে ডালের ভার মানুষকে বইতে হয়; গাছে যে ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক তার ভার মানুষের পক্ষে বোঝা; একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক সেই তো মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে।" (ঐ, ৫০২ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ সত্যের এই উভয়দিকের উপরই সমান জোর দিতে চেয়েছেন। তা না হলে যে দেখা ও জানার চেষ্টা অপূর্ণ, অঙ্গহীন হয়ে থাকে। 'জাপান যাত্রী'তেই দেখি

"সত্যকে যেদিকে ভুলি কেবল যে সেই দিকেই লোকসান তা নয়, সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে তার লোকসানের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেইজন্যেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উলটো দিকে টান আসে। সে বলে "বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—বৈরাগ্যের কোন বালাই নেই। সে বলে বসে, সংসার কারাগার ; মুক্তি খুঁজতে, শান্তি খুঁজতে, সে বনে পর্বতে সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে বলেই বড়ো করে প্রাণের নিশ্বাস নেবার জন্যে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এতবড়ো অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বলতে হয়েছে—মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।" (ঐ, ৫০১ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থেকে পরিপূর্ণ আনন্দলাভের আশ্বাস পান নি। মানুষ ভূমানন্দের প্রতিশ্রুতি পায় সীমাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দুঃসাহসিক অভিযানে। কবি মানুষকে জানিয়েছেন সেই অভিযানের আহ্বান। নিজে তিনি দেখা, চেনা ও জানার গণ্ডীকে অতিক্রম করে অদেখা, অচেনা এবং অজানার সন্ধানে চলেছেন। সে সন্ধান তাঁকে ক্রমশই সম্মুখ থেকে আরো সম্মুখে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু তাঁর যাত্রা সীমাকে অস্বীকার করে না, অনন্তের খোঁজে অন্তকে উপেক্ষা করে না। প্রতি মুহূর্তের সীমা এবং গণ্ডীকে স্বীকার করে তবেই তাদের উপরে জয়লাভ করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। রূপের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় অপরূপ বা অরূপের আবির্ভাব। সত্যের এই দ্বৈতপ্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন।

"আমার কথাটা এই যে কোনোটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যতকিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারও প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমার দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির হয়ে আছে,

আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়োচ্ছে তাতে দোষ কী? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা ভয়ংকর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তিনি চলেন এবং চলেন না, তিনি দূরে এবং নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা বলে জানা বলে পদার্থটা থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর-এক কালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ একপক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাকবে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্বেই ব্যবহার করেছি, এখনও ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যে চলেনা সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যে স্থির প্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।"

(আমার জগৎ নামক প্রবন্ধ, সঞ্চয় শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড ৫৬৩-৫৬৪ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ধ্রুব এবং স্থির তা কিন্তু গতিহীন, অচল, অনড় নয়।

অন্যত্র জগৎ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য অধ্যয়ন করলে ভুল ধারণার অবকাশ থাকে না।

"জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়া বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বলে না আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণুপরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহার কালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই জানি।

* * *

তারপর কালের ভিতর দিয়া দেখো সমস্ত জিনিসই প্রবহমান। তাই আমাদের দেশে বিশ্বকে জগৎ বলে—সংসার বলে; তাহা মুহূর্তকাল স্থির নাই, তাহা কেবলই চলিতেছে, সরিতেছে।

যাহা কেবলই চলে, সরে তাহার রূপ দেখি কী করিয়া? রূপের মধ্যে তো একটা স্থিরত্ব আছে। যাহা চলিতেছে, তাহাকে, যেন চলিতেছে না, এমন ভাবে না দেখিলে আমরা দেখিতেই পাই না। লাটিম যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে তখন আমরা তাহাকে স্থির দেখি। মাটি ভেদ করিয়া যে অঙ্কুরটি বাহির হইয়াছে প্রতি নিমিষেই তাহার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়াই তাহার পরিণতি ঘটে। কিন্তু যখন তাহার দিকে তাকাই সে কিছুমাত্র ব্যস্ততা দেখায় না, যেন অনন্তকাল সে এইরকম অঙ্কুর হইয়া খুশি থাকিবে, যেন তাহার বাড়িয়া উঠিবার কোনো মতলবই নাই। আমরা তাহাকে পরিবর্তনের ভাবে দেখি না, স্থিতির ভাবেই দেখি।

এই পৃথিবীকে আমরা ক্ষুদ্র কালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ইহাকে ধ্রুব বলিয়া বর্ণনা করিতেছি—ধরণী আমাদের কাছে ধৈর্যের প্রতিমা। কিন্তু বৃহৎকালের মধ্যে ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার ধ্রুবরূপ আর দেখিনা তখন ইহার বহুরূপী মূর্তি ক্রমেই ব্যাপ্ত হইতে হইতে এমন হইয়া আসে যে, আমাদের ধারণার অগোচর হইয়া যায়।

* * *

আমরা ক্ষণকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি—বস্তুত তাহার সে রূপ নাই কেন না সত্যই তাহা বদ্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার জন্য জানিবার জন্য তাহাকে স্থির করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে যে

নাম দিতেছি সে নাম তাহার চিরকালের সত্যনাম নহে। এইজন্যই আমরা যাহ কিছু দেখিতেছি জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে মায়া বলা হইয়া থাকে। নাম ও রূপ যে শাশ্বত নহে একথা আমাদের দেশের চাষারাও বলিয়া থাকে।" (রূপ ও অরূপ, সঞ্চয় শীর্ষক প্রবন্ধমালা, রচনাবলী, ঐ ৫১৬—৫১৭ পৃঃ)

প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুব বলেছেন কোন বস্তুকে, স্থির বলেছেন কাকে? তিনি ধ্রুব বলেছেন সেই ঐক্যতত্ত্বকে যা সমস্ত কিছুকে বিধৃত করে রয়েছে।

"কিন্তু গতিকে এই যে স্থিতির মধ্য দিয়া আমরা জানি এই স্থিতির তত্ত্বটা তো আমাদের নিজের গড়া নহে। আমাদের গড়িবার ক্ষমতা কিসের? অতএব গতিই সত্য. স্থিতিই সত্য নহে, একথা বলিলে চলিবে কেন? বস্তুত সত্যকেই আমরা ধ্রুব বলিয়া থাকি, নিত্য বলিয়া থাকি। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতি সূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নহিলে সেই জানার বালাইমাত্র থাকিত না—যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃসংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্র অর্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত নিমেষ মুহূর্তগুলিকে আমরা একদিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর একদিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতাসূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এইজন্যই কাল বিশ্বচরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চকমকিঠোকা স্ফুলিঙ্গপরম্পরার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার মতো প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্তকালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্তকে অন্য মুহূর্তের সঙ্গে যোগেই—জানিতে পারি বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।" (ঐ ৫১৭—৫১৮ পৃঃ)

আমরাও বলতে পারি যে এই যোগের তত্ত্বই—রবীন্দ্রজীবনদর্শণের মূল ভিত্তি।

তাই তিনি সত্যের কোন দিককেই উপেক্ষা করেন না, কোন প্রকাশই তার কাছে তুচ্ছ নয়। সেইজন্যই তাঁর সত্যের সন্ধান যেমন কোন একস্থানে থেমে থাকে না তেমনি বিশেষ সময়ের ও স্থানের খণ্ডিত সত্যকে অবহেলা করে না। তাঁর লক্ষ্য সব সময় থাকে সমগ্রের দিকে।

"যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। একদিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর একদিকে মুক্ত নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। একদিকে তাহা হইয়াছে আর একদিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলই চলিতেছে। এইজন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার। এইজন্য কোনো বিশেষরূপ আপনাকে চরমভাবে বদ্ধ করে না—যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।" (ঐ, ৫১৮ পৃঃ)।

অজানার সন্ধান এবং জানার প্রতি যথোচিত মর্যাদাদান এই উভয়দিকের মধ্যে কবি কি ভাবে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন, তার আর একটি সুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে।

"যখন ছোটো ছিলাম, মনে পড়ে, বিশ্বজগৎ আমার কাছে প্রতিদিন অন্ধকার রাত্রির গর্ভ থেকে নূতন করে জন্ম নিত। পরিচয় আর অপরিচয় আমার মনের মধ্যে এক হয়ে মিলেছিল। আমার সেই শিশুকাল পথিকের কাল। তখন পথের শেষের দিকে লক্ষ্য খুঁজি নি, পথের আশেপাশে চেয়ে চলেছি, যেন কোন্ আবছায়ার ভিতর থেকে আচমকা দেখা দেবে একটা 'কীজানি'—একটা 'হয়তো'। বারান্দার কোণে খানিকটা ধুলো জড় করে আতার বিচি পুঁতে রোজ জল দিয়েছি। আজ যেটা আছে বীজ কাল সেটা হবে গাছ, ছেলেবেলায় সে একটা মস্ত কী জানির দলে ছিল। সত্যের দিকে চেয়ে যে বলে 'জানি' সেও তাকে হারায়, যে বলে 'জানি নে', সেও করে ভুল—আমাদের ঋষিরা এই বলেন। যে বলে 'খুব জানি' সেই অবোধ সোনা ফেলে চাদরের গ্রন্থিকে পাওয়া মনে করে, যে মনে করেকিছুই জানিনে সে তো চাদরটাকে শুদ্ধ খুইয়ে বসে। আমি ঈশোপনিষদের এই মানেই বুঝি। 'জানি নে' যখন 'জানির' আঁচলে গাঁঠছড়া বেঁধে দেখা দেয় তখন মন বলে 'ধন্য হলেম'। 'পেয়েছি' মনে করবার মতো হারানো আর নেই।" (রচনাবলী, দশম খণ্ড, ৫৬৯ পৃঃ)

অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টি সত্ত্বেও কবি এখানে মানুষের জ্ঞানলাভের প্রক্রিয়ার যথার্থ

স্বরূপটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। মানুষের প্রতি মুহূর্তের জ্ঞান সীমিত, কিন্তু তারই ভিত্তিতে অজানাকে জানবার অভিযানে এগিয়ে চলতে হয়। আর সেই অভিযানের মাধ্যমে অজানা বা অজ্ঞাত সম্বন্ধে নিত্য নূতন তথ্য জানার গোচরে আসে। সেই সাধনার ধারাই রবীন্দ্রনাথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন সারা জীবন ধরে। জানা ও অজানা, সসীম ও অসীম, অন্ত এবং অনন্ত দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে তিনি দেখেছেন বিশ্বের অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্বকে, সেই এককে।

"অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকলকালে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই একথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান? নেতি নেতি করে জানান না, ইতি ইতি করে জানান। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করলেই একথা জানতে পারি, সর্বত্রই ইতি, সর্বত্রই সেই এষঃ। জীবনেও সেই এষঃ, জীবনের পরেও সেই এষঃ। কিন্তু তিনি নাকি অন্তহীন, সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনদিন পুরাতন নন; চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জানব, নূতন করেই পাব, তাঁতে নূতন করেই আনন্দ লাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মতন একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম তাহলে অনন্ত পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব, এ কখনো হতেই পারে না। কিন্তু, সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতর রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন এককে অন্তহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চলব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই—তবে বিশ্ব-রচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকা মাত্র। (পূর্ণ নামক প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, ৩৬১ পৃঃ।)

রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বরচনাকে উন্মত্ত প্রলাপ বা জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহকে মায়া-মরীচিকা মনে করেন নি, সে কথা বিশেষভাবে বলা বাহুল্য। উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে তাঁর মননে 'ইতি'র স্থানই প্রধান। তাই উপনিষদের প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করার বদলে তিনি তার মধ্যে নূতন তাৎপর্য আবিষ্কার করেছেন এবং লোকমানসের সামনে তুলে ধরেছেন।

"এই বিচিত্র জগৎ সংসারকে উপনিষদ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত

জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—এক মাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকল প্রকার জটিলতা, সকল প্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। (ধর্মের সরল আদর্শ নামক প্রবন্ধ, ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ২২ পৃঃ।)

পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধির বিষয়বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপটি কী? তা আসলে বিশ্বপ্রবাহের মূলগত ঐক্যতত্ত্ব। সেই সুপ্রাচীন যুগে মানুষ কিভাবে এই ঐক্যের ধারণায় উপনীত হয়েছিল সে সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন।

"নদী যেমন নানা বক্রপথে, সরলপথে, নানা শাখা উপশাখা বহন করিয়া নানা নির্ঝর ধারায় পরিপুষ্ট হইয়া নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহা-সমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ড খণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি মৃত্যু-বিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথ পরম্পরায় ভ্রাম্যমান—দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল, পথের প্রান্তে ছায়ানিবিড় তপোবনে গম্ভীর মন্ত্রে এই বার্তা উদ্‌গীত হইতেছে,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে, সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্যকারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল,

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে।

সহস্র বিভীষিকাও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতা-সন্ধানশ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল—

এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালন কর্তা—এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন।

বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল,

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো ইত্যাদি

সেই এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়।

মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুব শান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল—একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এককরিয়া সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল। (প্রাচীন ভারতের একঃ নামকপ্রবন্ধ, ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, ২৮-২৯ পৃঃ)

সেদিনের মানুষের চিন্তায় ঐক্যতত্ত্ব যে সুমহান অগ্রগতির নির্দেশ করেছিল তা সত্যই বিস্ময়কর। যদিও মানুষ সে তত্ত্বকে আবিষ্কার করেছিল ভাববাদেরই দৃষ্টিতে অর্থাৎ মানুষের নিজের চেতনাকেই সেই ঐক্যের আধার বলে কল্পনা করেছিল তবু তার যুগান্তকারী তাৎপর্যকে ছোট করে দেখা চলে না। জগৎপ্রবাহকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা, যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র, তুকৃতাক, জাদু, অসংখ্য দেবতা, ভূতপ্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাসের স্থানে সেই ঐক্যের ধারণা মানুষের জ্ঞান এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রকে যে সুদূরপ্রসারী করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐক্যের ধারণাই অন্তহীন কার্যকারণ পরম্পরার মধ্যে একটি নিয়মশৃঙ্খলার অস্তিত্ব উপলব্ধিতে মানুষকে সাহায্য করেছিল। উপনিষদীয় ঐক্যতত্ত্বের ভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধেই লিখেছেন।

"বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক ;

সেইজন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের

অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। একী অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতিহীন মহা-সূর্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্প সংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি উচ্ছ্বাস, তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে, একান্ত নির্জনে রহিয়াছি—শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। ইহার কারণ—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর। বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তি সকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বসংসার কী অনির্বচণীয় বিভীষিকা। তবে আমরা দুর্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মত অনুভব করিতেছি। এই যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজন-বিয়োজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন অখণ্ডভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোক লোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথককৃত করিতেছে; আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি, তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না। সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না।” (ঐ, ৩০—৩১ পৃঃ)

উপনিষদের ঋষিরা জগতের নানা বৈচিত্র্য এবং খণ্ডতার অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্বকে খুঁজে পেয়েছিলেন মানুষের মনে, অপ্রমেয় ধ্রুবকে দেখেছিলেন মানবাত্মায়। রবীন্দ্রনাথ সেই পথই অনুসরণ করেন। কিন্তু যখন তিনি সেই ঐক্যের তত্ত্বকে বহির্জগতের ঘটনাপ্রবাহ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তখন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

“মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তিকিঞ্চন।

মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইহাতে ‘নানা’ কিছুই নাই। বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন; মনই নানার মধ্যে সেই একক দেখে, সেই এককে প্রার্থনা করে,

সেই এককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই একককে না পাইলে মনের সুখশান্তি মঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের অবসান নাই। সেই ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে মন অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না। সে খণ্ড খণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিক ধর্ম-বশতই কখনো জানিয়া, কখনো না-জানিয়া, কখনো বক্রপথে, কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে, সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায় তখন এক মুহূর্তেই বলিয়া উঠে, আমি অমৃতকে পাইয়াছি ; বলিয়া উঠে

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবতি।

অন্ধকারের পরে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।" (ঐ, ৩২—৩৩ পৃঃ)

ঐ প্রবন্ধেই কবি বলেছেন,

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় যে ইঁহাকে নানা করিয়া দেখে। খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে ; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে ; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই একককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না।" (ঐ, ৩২ পৃঃ)

আপাত ও বিচ্ছিন্নদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে কবি একের সন্ধানে বহুকে বা নানাকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অদ্বৈত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা দ্বৈতকে তথা বহুবিচিত্র জগতকে অস্বীকার করে না, বিচিত্রকে দেখে সেই একের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং বিধৃত ভাবে।

"সমুদ্রে ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউয়ের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে তার মনেই থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড, এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারের অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়। তাছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্তা আছে ; যদি তা কান পেতে

শুনি তবে শুনতে পাব, এই বিরোধ, এই অনৈক্যই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অদ্বৈতম্। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্নবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলেনি। গণণাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম, অন্তে অদ্বৈতম, অন্তরে অদ্বৈতম।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুনতে পেয়েছে:

শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে, তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে, নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে; শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্। এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি সৃষ্টি করছেন; নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল একথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে, তারপরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজাপথে টেনে আনা হচ্ছে, এ কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্ছে। এইজন্যেই গোড়াতেও প্রথম এখনও প্রথম, গোড়াতেও নবীন এখনও নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ। বিশ্বের আরম্ভেও তিনি অন্তেও তিনি—সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।" (চিরনবীনতা নামক প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৩১৩ পৃঃ।)

বিশ্বপ্রবাহের অন্তর্নিহিত ঐক্যতত্ত্বের অতিবাস্তব সত্যটি উপনিষদের ঋষিদের চেতনায় প্রতিফলিত হয়েছিল উলটোভাবে। অর্থাৎ ঐক্যের উপলব্ধিকে চেতনায় বাইরের প্রতিফলন রূপে দেখার বদলে তাঁরা সেই চেতনাকেই বহির্বিশ্বে প্রসারিত করেছিলেন। তবু সেই অদ্বৈতজ্ঞান মানুষের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেনি। তার কারণ, প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই অদ্বৈতের বাস্তব প্রকাশগুলিকে তাঁরা বস্তুনিষ্ঠভাবেই স্বীকার করে কাজে প্রবৃত্ত

হয়েছেন। পরবর্তী যুগে অদ্বৈততত্ত্বের নামে বাস্তবজগৎকে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছিল। সে প্রচেষ্টার পিছনে যে সামাজিক কারণগুলি কাজ করেছিল সেগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধানের দ্বারা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের উপর নূতন আলোক সম্পাত হবে। রবীন্দ্রনাথ যে ঐ পরবর্তী ধারাকে অনুসরণ করেন নি সে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। তিনি যখন অদ্বৈততত্ত্বকে বিশ্ব এবং মানব জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন তখন ঐ বস্তুনিষ্ঠদিকটিকেই প্রাধান্য দান করেছেন। তথাকথিত মায়াবাদকে তিনি বর্জন করেছেন। এইখানেই তাঁর উপনিষদীয় দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।

"উপনিষৎ বলিয়াছেন, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্তরূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতম্।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না; এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলই ঘুরিতেছে ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়?

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই। সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপকে প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখতাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া? আমাদের চিত্ত সংসারে আপন-পরের ভেদ বৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে; সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈত স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন।

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব একথা মনে রাখিতে হইবে, পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে, যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই, তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে—তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয়! রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াইতো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই, তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে; আলোক কেবল আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না, তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে; এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।" (দুঃখ প্রবন্ধ, ধর্মশীর্ষক প্রবন্ধমালা, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড ৫৯-৬০ পৃঃ)

শান্তম্ শিবমদ্বৈতম এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

"অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশদিকে ছুটিয়াছে; যিনি শান্তং তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গাদিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না; জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের

সকলের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠাপড়া, কতই ভাঙ্গাচোরা চলিতেছে; কত হানাহানি, কত বিপ্লব; তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাতচিহ্ন বিশ্বের চিরনূতন মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল, অনন্ত কোলাহলের মর্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপর ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।" (শান্তং শিবমদ্বৈতম নামক প্রবন্ধ, ধর্মশীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৬৮ পৃঃ)

এই শান্তং যে গতিহীন অচল অনড় নয় সে কথা কবি বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

"জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি তো লুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচল প্রতিষ্ঠ আধার স্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সংগীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতে যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে তিনিই শান্তম্।" (ঐ, ৬৮-৬৯ পৃঃ)

পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শান্তম্ অর্থে কবি দেখেছেন বিশ্বের ঐক্যতত্ত্বের অন্তর্নিহিত নিয়মশৃঙ্খলা-কার্যকারণ-কাল পরম্পরার দিকটিকে। এই প্রসঙ্গে একটি কারখানার দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি নিজ বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন। কোন অজ্ঞ লোক কারখানায় প্রবেশ করলে যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের আবর্তন আস্ফালন দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই বহুমুখী কর্ম-চাঞ্চল্যের পশ্চাতে দেখে নিয়মের দ্বারা অবিচল ভাবে পরিচালিত একটি সুশৃঙ্খল কর্মপ্রণালী। কবির মতে, বিশ্বকে যারা উপরোক্ত দৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ হয় তারা শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য খুঁজে পেয়ে নির্ভয় এবং আনন্দিত হয়।

ঐক্যতত্ত্বের যে দিকটি সমগ্র বিশ্বপ্রবাহের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করে এবং তাকে অখণ্ডরূপ দিয়ে পরিপূর্ণতার অভিমুখে নিয়ে চলেছে তাকেই কবি আখ্যা দিয়েছেন শিবম্, মঙ্গল বা কল্যাণ।

"এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং তিনি শিবম্। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দাম শক্তিকে ধারণ, করিয়া একটি মঙ্গল লক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিখিল জগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পারের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষযোজনদূরবর্তী সূর্য চন্দ্র-গ্রহ-তারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার, এক বিরাট কলেবররূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ প্রত্যংশ তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণ সূত্রে, একই পালন সূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণীশক্তি, সেই পালনীশক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে, মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ লাভক্ষতি সকলের মধ্যেই শিবং শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধবন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। যাহা আলিঙ্গন তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল স্থল আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানিনা তাহারই বিরাট প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মতো নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের সকলেও তেমনি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণ, সকল সম্বন্ধ, সকল কর্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া, নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্।" (ঐ, ৬৯-৭০ পৃঃ)

শান্তম্ এবং শিবম্ হল সেই একের, অদ্বৈতম্ এর দুই দিক। অদ্বৈতম্ সম্পর্কে এই প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,

"সংসারের সব কিছুকে পৃথক করিয়া, বিচিত্র করিয়া গণণা করিতে গেলে

বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু তো সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা তো চিন্তা করিতে পারিতেছি ; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে তো একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে তো প্রতি মুহূর্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না ; সমস্ত পৃথিবীকে তো আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে তো কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম, কত মানুষ ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে ; কিন্তু সে বোঝার ভারে আমাদের হৃদয় মন তো একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না ? সমস্ত গণণাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন ' যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও জানিতাম কি ? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকারের আদান প্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি ? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক, প্রধানত আমরা যাহা কিছু চাই তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য।" (ঐ, ৭০ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ সেই ঐক্য তত্ত্বকে কেবল মাত্র বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করে ক্ষান্ত হন নি, হৃদয়ের দ্বারা গ্রহণ করেছেন। 'রসোবৈসঃ' অর্থাৎ ব্রহ্ম রসস্বরূপ এই ভাবে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সেই অনুভূতির অভিব্যক্তিতে অনেক সময় অধ্যাত্মবাদের প্রাধান্য সত্ত্বেও যোগের তত্ত্বটি কখনই অনুপস্থিত নয়।

"হে সর্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা-কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মাঝে যে কী আশ্চর্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়। মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে, এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্ছে। মনে হয়, যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্ব-

স্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মূর্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না।

* * * *

তোমার অমৃতময় অনুভূতির দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত। এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্যময় হবে; দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা তো কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন্ প্রেমের সুগন্ধ বসন্ত বাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি। বলেছেন : রসো বৈ সঃ। সেইজন্যেই জগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রঙ, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে, বিচিত্র করে ভোগ করছি।" (বিশ্ববোধ নামক প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড ৩২৭-৩২৮ পৃঃ।)

তারপরে কবি প্রার্থনা জানিয়েছেন

"তোমার যে রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে—যে রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়কাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না, ফুরিয়ে যাচ্ছে না—মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায় মাতায়, স্বামী স্ত্রীতে, পুত্রে কন্যায়, বন্ধু বান্ধবে নানা দিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে—সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে অমৃত তারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও!" (ঐ, ৩২৮ পৃঃ)

উপরের উদ্ধৃতিটিতে দেখা যায় যে যোগের তত্ত্ব কবির অনুভূতিতে প্রতিফলিত হয়ে অন্তর থেকে বাহিরের দিকে এসেছে। তেমনি যখন সেই অনুভূতি বাহির থেকে অন্তরের দিকে যাত্রা করে তার অভিব্যক্তিও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'তে সূর্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

"প্রাণের যোগ নয় তো কী? সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন, আমাদের রূপরস, সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ওই তেজই মানসভাব ধারণ করে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব, এত রস। ওই যে জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিইত' আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনই আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সে কি এই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়-স্বরূপ নয় যে জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওঙ্কার ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে?

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে, গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে জয় হোক্। বলছে অপাবৃনু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা-খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা-খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃনু, এই প্রার্থনারই নির্ঝরধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক্।" (রচনাবলী, দশম খণ্ড, ৫৪৩ পৃঃ।)

কবির কাছে রসই বড়। সর্বত্র সেই রসের প্রকাশ দেখে তাঁর অন্তরে জাগে যে রসানুভূতি তাই ত' কাব্যের প্রাণবস্তু। সেখানেই নামে কাব্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ। বুদ্ধির দ্বারা যাকে তিনি জানেন যোগের তত্ত্ব বলে, হৃদয়ে তাই প্রেমরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। সারা জগতে দেখেন প্রেমের লীলা এবং নিজেকে সেই লীলার কবি বলে ঘোষণা করেন।

"তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া

বলিতেছি, আমার মধ্যে অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধিমন, আমার নিকট-প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝিনা, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা। আমার চোখে যে আলো ভালো লাগিতেছে, তৃণলতার যে শ্যামলতা ভালো লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভালো লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গমালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।" (আত্ম-পরিচয়, রচনাবলী, দশম খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)

'আত্ম-পরিচয়' এরই শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনবেদ তথা কবির ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

"আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—একদিন আমি বলেছিলাম 'আমি চাইনে হতে নব্যবঙ্গে নবযুগের চালক'—সে কথা সত্য বলেছিলাম। শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপ ক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহুবিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত। আমরা নাচি, নাচাই, হাসি, হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি—যে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীব আমরা তাঁরই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমাদের কাজ। মানবকে গম্যস্থানে চালাবার দাবি রাখিনে, পথিকদের চলার সঙ্গে চলার কাজ আমার। পথের দুইধারে যে ছায়া, যে সবুজের ঐশ্বর্য, যে ফুলপাতা, যে পাখির গান, সেই রসের রসদে জোগান দিতেই আমরা আছি। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে, সুরে গানে, নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখ দুঃখের সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।" (ঐ, ২০৬ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের উপর বাংলার বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব সুবিদিত। ব্রহ্ম বা

অদ্বৈতম্‌কে তিনি কখনও ঈশ্বর, কখনও বিরাট পুরুষ, কখনও জীবনদেবতা, কখনও প্রিয়তম বলে সম্বোধন করেছেন। প্রেমের অনুভূতি এক এক সময় তাঁর সমস্ত অন্তর ছাপিয়ে উঠেছে। আবার অন্য সময় তিনি প্রেমের তত্ত্বকে যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। যে সব ভাষ্যকার রবীন্দ্রমানসে রহস্যঘন অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম অনুভূতিকে প্রধান বলে দেখাতে চান তাঁরা যে কবির উপরোক্ত বক্তব্যগুলিকে প্রাধান্য দেবেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু যাঁরা অন্য দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করতে চান, তাঁদের পক্ষেও কবি-মানসের এই দিকটিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাহলে শুধু যে কবির সৃষ্টির অনেক সুন্দরতম এবং মধুরতম জিনিষের রসাস্বাদন থেকে আমরা বঞ্চিত হবো তাই নয়। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমের চরিত্র, তার গভীরতা এবং ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিতান্তই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

একটু অনুধাবন করে দেখলে বোঝা যায় যে কবির অন্তরের প্রেমবন্যার লক্ষ্য কোন কল্পলোকবিহারী তথাকথিত ঈশ্বর নয়। তার লক্ষ্য হল সেই অসীম, অনন্ত বিশ্বসত্তা যা সমস্ত ব্যক্ত জগতকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ মানবতাকে দেখেছেন সেই বিশ্বসত্তারই প্রকাশরূপে। সেই আধ্যাত্মিক প্রেমই তাঁকে মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছে। সুতরাং এই প্রেমের প্রকৃতি এবং গতি বিশেষভাবে অধ্যয়নের অপেক্ষা রাখে।

প্রথমে দেখা যাক্‌ কবি কি ভাবে উপনিষদের শিক্ষার সাহায্যে প্রেমতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। "পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপে যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা একি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে? তা কখনোই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেন না, আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্ছে তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুদ্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসতমকে, সেই পরমানন্দস্বরূপকে চাচ্ছে—নইলে তার তৃপ্তি নেই।" (সমগ্র এক নামক প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ)

ঐ প্রবন্ধেরই উপসংহারে কবি লিখেছেন,

"বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গলরূপে আছে তা নয়, সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরূপে বিরাজ করছে।

এই বিশ্বের সমগ্রতাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিরনির্ঝরধারারূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কোনোদিন সে আর নিঃশেষ হল না।

এইজন্যই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন; সে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলতে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিলতে হবে—তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।" (ঐ, ২৬৫ পৃঃ)

'প্রার্থনা' নামক প্রবন্ধে, উপনিষদের সেই সুবিখ্যাত উক্তি 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম'—ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,

"মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেম স্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণভাবে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি: যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম।" (রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১২০ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে উপনিষদের ঐ উক্তি যে একজন নারী অর্থাৎ মৈত্রেয়ীর মুখে ভাষা পেয়েছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রেমের অনুভূতি যে কত গভীর এবং ব্রহ্ম বা অমৃতময়কে উপলব্ধির পক্ষে সেই গভীরতা কত প্রয়োজন তা নারীর পক্ষেই বোঝা সম্ভব।

"উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি, কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণী হৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে। হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে। হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে! হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও,

নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্নরাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তাহলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম এধিঃ—হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি তো চিরপ্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও,—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক্। হে রুদ্র, হে ভয়ানক, তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তোমার যে প্রসন্ন সুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্, তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মতো বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্ত কালের পরিত্রাণ।" (ঐ, ১২০-১২১ পৃঃ)

কবির এই প্রেমতত্ত্বের প্রকৃতিও দ্বৈত অর্থাৎ তার মধ্যে দুইটি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির অস্তিত্ব রয়েছে। তদনুযায়ী এক এক সময়ে তাঁর মনে প্রবল হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক দিকটি অর্থাৎ অন্তরে পরমাত্মা বা সেই অমৃতময়ের সাথে একাত্মতা-বোধের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। জাগে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের ইচ্ছা।

"তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে পাওয়ার কথাটা ঠিক বলা চলে না। কেন না, তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন, তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই, —একথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে, অতএব আর এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব, 'ব্রহ্মকে পেতে হবে' একথাটা ঠিক বলা চলে না—'আপনাকে দিতে হবে' বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে। সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন, আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন কি বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

*   *   *   *

অতএব, আমরা যেন না বলি যে 'তাঁকে পাচ্ছিনে কেন', আমরা যেন বলতে পারি 'তাঁকে দিচ্ছিনে কেন'। আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

আমার যা আছে আমি সকল দিতে
পারি নি তোমারে নাথ।
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান
সুখ দুঃখ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খরচ করে ফেলো—তাহলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত, কতমত—
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।

আমাদের যত দুঃখ বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছিনে বলেই; সেইটে ঘুচলেই যে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব, আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।"

"উপনিষৎ বলেছেন : "ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে। ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্য নয়, নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।" (আত্মসমর্পণ, শান্তিনিকেতন শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনবলী, দ্বাদশখণ্ড ২৬২-২৬৩ পৃঃ)

'প্রেমের অধিকার' প্রবন্ধে ঐ তন্ময়তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন,

"কাল রাত্রে এই গানটা আমার মনের মধ্যে বাজছিল,

নাথহে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখোনা, থেকোনা দূরে।
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমায় হেরিব,
সব বাধা ভাঙিয়া দাও।

কিন্তু, এ কেমন প্রার্থনা! এ প্রেম কার সঙ্গে? মানুষ কেমন করে একথা কল্পনাতে এনেছে এবং মুখে উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে?

*   *   *   *

মানুষ জগদীশ্বরের সাথে প্রেম করতে চায়, এও কি তার সেই অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহংকারেরই একটা অশান্ত পরিচয়?

কিন্তু, এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। তাঁর প্রেমের জন্য যে লোক খেপেছে সে যে নিজেকে দীন করে, সকলের পিছনে সে যে দাঁড়ায় এবং

যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারি তাদের পায়ের ধূলো পেলেও সে যে বাঁচে। কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশ্বর্যের কাঙাল সে নয়—সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

সেইজন্যেই জগৎ সৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য বলে আমার মনে হয়েছে যে মানুষ তাঁর প্রেম চায়, এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড়ো সত্য, বড়োলাভ বলে চায়। কেন চায়? কেননা, মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন, তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম, এতে আর লজ্জা ভয় কিসের?" (ঐ ১৫০-১৫১ পৃঃ)

যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেখানে দ্বৈত অদ্বৈতের প্রশ্ন এসে পড়ে। কবি সেই তর্কের মধ্যে যেতে রাজী নন। তিনি প্রেমের দ্বারা মিলনে তর্কের সমাধান করতে চান।

"আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তার বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এইজন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এই জন্যেই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকে তাকিয়েই উপনিষৎ বলে গিয়েছেন: দ্বা সুপর্ণাসযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজায়তে। বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখির মতো, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।" (ঐ, ১৫১ পৃঃ)

প্রেমের সাধনায় কবি কখনও মিলনের অনুভূতি লাভ করেছেন। সেই অনুভূতিকে যেমন প্রকাশ করেছেন অজস্র গানে ও কবিতায়, তেমনি কয়েকটি কাব্যময় প্রবন্ধে তাকেই রূপ দিয়েছেন।

"কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে—বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে। আমি কোনোমতেই ভুলতে পারছিনে—

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।
অমল কমল মাঝে জ্যোৎস্নারজনী মাঝে
কাজল ঘন-মাঝে নিশি আঁধার মাঝে
কুসুম সুরভি মাঝে বীণরণণ শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে।

* * * *

কাল কৃষ্ণ একাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণকরে সেই বীণকার তাঁর রম্যবীণা বাজাচ্ছিলেন ; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম ; সেই ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে গাঁথা পড়ছিল। তারপরে যখন শুতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে, আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনও সেই জাগ্রত বীণকাবের নিশীথ রাত্রের বীণা বন্ধ হবে না—তখনও তাঁর যে ঝংকারের তালে নক্ষত্রমণ্ডলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রানিভৃত দেহনাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থামবেনা, সর্বাঙ্গে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ লক্ষ জীবকোষ আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্ক-সভার সঙ্গীতচ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাকবে।"

(শোনা নামক প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন শীর্ষক প্রবন্ধমালা, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড ১২৬-১২৮ পৃঃ)

তেমনি এক এক সময় তাঁর অন্তর আকুল করে জেগেছে বিরহের মর্মন্তুদ বেদনা।

"আজ কেবলই মনে হচ্ছে এই যে বর্ষা, এতো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়। এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার—তারই দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে ; আমার সমস্ত আকাশ বার বার করে বলছে 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া'। কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়—এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে ; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহ সন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তাহলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না। কিন্তু, শুধু 'কেমন করে কাটবে নয় তো, কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিনরাতিয়া। সেইজন্যে হরি বিনে কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ

আছে—তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে—বিরহের সমস্ত বক্ষ জুড়ে দিয়ে সে আছে—সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারই মাঝখানে গভীর ভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই হরি বিনে কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।"

(শ্রাবণসন্ধ্যা, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৩৫২ পৃঃ)

কবির প্রেমতত্ত্বের অপর যে দিকটির কথা বলা হয়েছে তা নিছক হৃদয়াবেগের বন্যায় ভেসে চলে না। সেদিকটিতে যুক্তির প্রাধান্য এবং বিশ্বস্বীকৃতির ঘোষণা সুস্পষ্ট। বিশ্বের বিধান বা কার্যকারণ-পরম্পরা ও নিয়মশৃঙ্খলাকে তা অস্বীকার করে না।

"প্রকৃতির দিকে নিয়ম, আর আমাদের আত্মার দিকে আনন্দ। নিয়মের দ্বারাই নিয়মের সঙ্গে এবং আনন্দের দ্বারাই আনন্দের সঙ্গে আমার যোগ হতে পারে।

এইজন্যে যে দিকে আমি সর্বসাধারণের, যে দিকে আমি বিশ্বপ্রকৃতির, যে দিকে আমি মানবপ্রকৃতির, সেদিকে যদি আমি নিজেকে নিয়মের অনুগত না করি তাহলে আমি কেবলই ব্যর্থ হই। একটি ধূলিকণার কাছ থেকেও আমি ভুলিয়ে কাজ আদায় করিতে পারি নে; তার নিয়ম আমি মানলে তবেই সে আমার নিয়ম মানে।

এইজন্যে আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।" (তিন নামক প্রবন্ধ, রচন্যবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১৫৯ পৃঃ)

"বিধান" নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন

"কিন্তু বিধান জিনিসটা তো খামখেয়ালি হলে চলে না। আজ একরকম, কাল অন্য রকম, আমারপক্ষে একরকম অন্যের পক্ষে অন্যরকম, কখন কি রকম তার কোনো স্থিরতা নেই—এতো বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখ-সুবিধার জন্য যদি বলি, তোমার বিধানের সূত্র একজায়গায় ছিন্ন করে দাও, একজায়গায় অন্য-সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের পার্থক্য করে দাও' তাহলে বস্তুত বলা হয় যে 'এই কাদাটুকু

পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্য সূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্য তারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে দাও'।

এই বিধান জিনিসটা কারও একলার নয় এবং কোনো-একখণ্ড সময়ের নয়—এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনো কালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষদ বলেছেন, যিনি বিশ্বের প্রভু, তিনি 'যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'। তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জন্য সমস্তই যথার্থভাবে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বতকাল—এ বিধান অনাদি অনন্তকালের বিধান, তার পরে আবার এই বিধান যাথাতথ্যতঃ' বিহিত হচ্ছে; এর আদ্যোপান্তই যথাতথ, কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে এবং পরিষ্কার করে কিছু বলে নি।

কিন্তু, শুধু তাই যদি হয়, যদি কেবল অমোঘ নিয়মের লৌহ-সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতারূপেই বসে থাকেন, তাহলে তো সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ-পাথর ধূলি-বালিরই সমান হই। তাহলে তো আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিন্তু, তিনি শুধু তো বিধাতা নন, 'স এব বন্ধুঃ', তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্‌খানে? বন্ধুর প্রকাশ তো নিয়মের ক্ষেত্রে নয়—সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে?

বিধাতার কর্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে, আর বন্ধুর আনন্দ-নিকেতন আমার জীবাত্মায়।

মানুষ একদিকে প্রকৃতি আর-একদিকে আত্মা-এক দিকে রাজার খাজানা জোগায়, আর একদিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর-একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যে দিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে প্রকৃতি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেই দিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন, আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি, তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে

ধরে রেখেছেন।” (ঐ, ১৫৮-১৫৯ পৃঃ)

কবি বিশ্ববিধান বা নিয়মকে বলেছেন বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তি চেয়েছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে এই মুক্তির পথ কি অর্থাৎ মুক্তি আসবে কিভাবে? গোঁড়া অধ্যাত্মবাদীরা এই প্রশ্নের যে উত্তর দেন তা সুবিদিত। তাঁরা অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা বন্ধনকে অতিক্রম বা অস্বীকার করতে চান। রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছেন তার মধ্যে তাঁর বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর মূল চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

“যেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখ সুবিধা কিছুই ঘটে না; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম-বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখ ত শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই ‘মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্’। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটা কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তবস্তুতি অনুনয় বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না, সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে, তখনই সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।” (নিয়ম ও মুক্তি নামক প্রবন্ধ, শান্তিনিকেতন শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ২৭৭ পৃঃ)

ঐ প্রবন্ধেই আনন্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি মন্তব্য করেছেন।

“বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তখন সেইটাতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।” (ঐ)

‘মুক্তির পথ’ নামক প্রবন্ধটির বক্তব্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

“বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি’।

* * * *

আমার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই, তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি; যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি, সে বিশ্বেও সর্বত্র মূঢ়তা দেখে; বিশ্ব তার কাছে ভূত প্রেত দৈত্য দানায় বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে, আনন্দ না থাকে, তবে বিশ্ব আমার কাছে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা; প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি। কোনো ব্যায়ামের দ্বারা, কোনো কৌশলের দ্বারা মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গল সাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞান সম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিয়তাকে অতিক্রম করে সে অনন্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তখনই প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। একেই তো বলে মুক্তি।" (ঐ, ২৯২ পৃঃ)

উপনিষদীয় ঐক্যতত্ত্বের মধ্যে যে অন্তর্বিরোধ রয়েছে তার সমাধানের চেষ্টা শঙ্করাচার্য এবং তাঁর অনুগামীরা করেছেন একভাবে। তাঁদের মতে দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ এবং ব্রহ্ম, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, প্রকৃতি এবং আত্মা এই দুইয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করলে অদ্বৈততত্ত্বের হানি হয়। রবীন্দ্রনাথকেও এই অন্তর্বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি দ্বৈত-অদ্বৈতের তর্কে নিরুত্তর হয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও নিরুত্তর হয়ে থাকতে পারেননি বা থাকেননি। তিনি যে ভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছেন তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। 'সামঞ্জস্য' নামক প্রবন্ধে কবির সেই দৃষ্টিভঙ্গীর একটি পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়।

"আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত

দ্বন্দ্ব এক হয়ে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্ত মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্বত্র উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপনভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী ; হাঁ যেমন না কে কাটে, না যেমন হাঁকে কাটে, তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই, এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না, আবার তাদের বিরুদ্ধরূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড, এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যেই কেন যে আমি অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারিনে, কিন্তু স্বার্থ জিনিসটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা, তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, দুই যেমন সত্য একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটিকে তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না—এ যে প্রেমের কাণ্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথা দেখতে পাই। য একোঽবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি। তিনি এক এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই, অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজন সকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে যান? তিনি যে প্রেমস্বরূপ,—তাই শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্যগাৎ শুক্রং, আবার তিনিই ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ, অনন্ত দেশে তিনি শুদ্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্তকালে তিনি বিধান করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি, গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটি মাত্র জায়গায় দেখতে পাই সে হচ্ছে প্রেমে।" (রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১১৩-১১৪ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বের উভয় দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যায়। প্রেমের সাধনায় হৃদয়াবেগেরই প্রাবল্য। সেই হৃদয়াবেগ দুকূলপ্লাবী বন্যার

মত উন্মাদনায় মানুষকে জগৎ ও জীবনে বিমুখ করে তুলবে বলে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। অনির্বচনীয় অপার্থিব রসাস্বাদনের আগ্রহে মানুষ যে সত্যের প্রকৃত রূপকে ভুলে মরীচিকার পিছনে ছোটে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। সে সম্বন্ধে কবির বক্তব্য কি ?

রবীন্দ্রনাথ সেই বিপদের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন,

"প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটাদিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই—কর্মকে বিস্মৃত হই. জ্ঞানকে অমান্য করি।" (বিকারাশঙ্কা নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ১২১ পৃঃ)

বিকারাশঙ্কার প্রতিষেধক হিসাবে কবি প্রেমের পরিপূর্ণ রূপের ব্যাখ্যা করেছেন। বিকারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

"চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে মোদো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে; তখন আর সে বন্ধন মানে না; অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বর-বিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না।" (ঐ, ১২২ পৃঃ)

অসতীর প্রেমকে কশাঘাত করেই কবি নীরব থাকেন নি, সতীর স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মতামত বিশদভাবে ব্যক্ত করেছেন। সে প্রেমে থাকবে ধী, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা। সে প্রেম সংস্কারগত অন্ধ প্রেম নয়। তার দৃষ্টি জাগ্রত। সে যাকে চায় তার সম্যক পরিচয় পাওয়ার প্রয়াসী হয়, নতুবা যে নিজের জ্ঞানকে করা হয় অপমান।

"সতী আত্মা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব ছিল না। তিনি যে অমৃত চেয়েছিলেন তা পরিপূর্ণ-প্রেম—তা কর্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম নয়। তিনি বলেছিলেন, অসতো মা সদ্গময়—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। তিনি বলেছিলেন, আমি যাঁকে চাই

তিনি যে সত্য; নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে, সত্যের বন্ধনে না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার পরিণয়-বন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে চিন্তায় কর্মে—সত্য হতে হবে, তাহলেই যিনি বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে—নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, —এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা" (ঐ, ১২২ পৃঃ)

বৈষ্ণবের প্রেম সাধনার সাথে রবীন্দ্রনাথের সাধনার মৌলিক পার্থক্য এইখানে, অন্ততঃ বৈষ্ণবসাধনা বলে যে ভাবটি লোকসমাজে সুপরিচিত তার সাথে। কেননা সেই ভাবের মূল কথাই হল রসের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পন। তা মানুষকে শুধু জগৎবিমুখ নয় নিষ্ক্রিয় নির্বীর্য করে ফেলে। রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমের সাধনা করতে চেয়েছেন সেখানে সত্যের সংযম, জ্ঞানের আলোক এবং আনন্দের রস তিনের সমন্বয় হবে। সেই প্রেম মানুষকে নিষ্ক্রিয় নিবীর্য করে তোলার বদলে উদ্বুদ্ধ করে দুঃখবিপদকে তুচ্ছ করতে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অমৃতের সন্ধানে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে তুলতে। এ সাধনা খুবই কঠিন, কিন্তু কবি অগ্রসর হয়েছেন সেই ক্ষুরস্য ধারা নিশিতয়া দুর্গম পথেই। তাই তিনি শুধুমাত্র মাধুর্যেরই নয় বীর্যেরও পূজারী।

"সমস্ত সুন্দরের মাঝখানে যেদিন সেই সুন্দরকে দেখলুম, সমস্ত মাধুর্যের ভিতর যেদিন সেই মধুরকে পেলুম, সেদিন আমার মাধুর্যের পরিচয় দেব কিসে? মাধুর্যে বিগলিত হয়ে কী পরিচয় দেব? না, মাধুর্যের পরিচয় মাধুর্যে নয়, বীর্যে। সেদিন মৃত্যুকে স্বীকার করে পরিচয় দেব। বলব 'প্রিয়তম হে, মরব তোমার জন্য। * * * যেদিন বলতে পারব যিনি মধুর পরম মধুর, যিনি সুন্দর পরম সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন, সেদিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দলে চলে যাব। সেদিন জানব যে, কর্মে কোনো ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোনো বাধাকে বাধা বলে মানব না। মৃত্যু সেদিন সামনে দাঁড়ালে তাকে বিদ্রূপ করে চলে যাব। সেদিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে। দেখতে হবে দুঃখকে মৃত্যুকে সে ভয় করে না। স্পর্ধা করে বীরত্ব করলে সে বীরত্ব টেকে না—জগৎ-ভরা আনন্দ যেদিন অন্তরে সুধাস্রোতে বয়ে যাবে সেদিন মানুষের সমস্ত মনুষত্ব সরল হবে, তার কর্ম সহজ হবে, তার ত্যাগ সহজ হবে। সেদিন মানুষ বীর। সেদিন ইচ্ছা করে সে

বিপদকে বরণ করবে।

প্রিয়তম যে জাগবেন সে খবর পাব কেমন করে? গান যে বেজে উঠবে। সে তো সহজ গান নয়, সে যে রুদ্রবীণার গান। সেই গান শুনে মানুষ বলে উঠবে 'সৌন্দর্যে অভিভূত হব বলে এ পৃথিবীতে জন্মাইনি। সৌন্দর্যের সুধারসে পেয়ালা ভরে তাকে নিঃশেষে পান করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলে যাব'। মাধুর্যের প্রকাশ কেবল ললিতকলায় নয়। এই সৌন্দর্যসুধার মধ্যে বীর্যের আগুন রয়েছে। মানুষ যেদিন এই সৌন্দর্যসুধা পান করবে সেদিন দুঃখের মাথার উপর সে দাঁড়াবে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মানুষ বিষয় বিষরসের মমতায় বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দরসকে পান করল না। সেই আনন্দের মধ্যে বীর্যের অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নিতেই সমস্ত গ্রহচন্দ্রলোক দীপ্যমান হয়ে উঠেছে—সেই বীর্যের অগ্নি মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলল না। অথচ মানুষের অন্তরাত্মা জানে যে, জগতের সুধাপাত্র পরিপূর্ণ আছে বলেই মৃত্যু এখানে কেবলই মরছে এবং জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করছে, প্রাণের কোথাও বিরাম নেই।" (মাধুর্যের পরিচয়, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড ৪৭৬—৪৭৭ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রেমের বিকারাশঙ্কা সম্বন্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন তেমনি কশাঘাত করেছেন আধ্যাত্মিকতার জগৎ-বিমুখতার মনোভাবকে। কর্ম-পরিহার করা এবং মানব সমাজের প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে তিনি বলেছেন আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা।

"আমাদের দেশে এমন সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহংতত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন জীবপ্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্য, মানুষের স্বাধীন দায়ীত্বও ত্যাগ করেন মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে-উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সব কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু—মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ—যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।" (মানুষের ধর্ম, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৫৯৭ পৃঃ)

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' প্রবন্ধে তিনি উপরোক্ত আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

"যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি—এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া, এখানকার কর্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া, পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের সার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা—তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতার চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ, সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থ সাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশঃই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ এবং সর্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ শোক দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।" (রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৬৩৩ পৃঃ)

স্বার্থপরতা নয়, জগৎকে মিথ্যা বলে উপেক্ষা নয়—ব্রহ্মকে সত্যস্বরূপে জানা এবং সত্যের সমগ্র প্রকাশকে স্বীকার করে সংসারের প্রতি কর্তব্য পালন করা। এই হল উক্ত 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' নামক প্রবন্ধের মর্মবাণী।

"কোন সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্তব্যবন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই 'না' করিয়া দিয়া একাকী আনন্দ-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের একদিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশপালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই

বলুক, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান করে সে কঠিন কর্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে এবং ভোগে এবং কর্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান সংসার—আমাদের এই কর্মক্ষেত্র; ইহাই ধর্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির।" (ঐ, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৬৩৩-৬৩৪ পৃঃ)

কবি উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে উপনিষদীয় তত্ত্বকে নিম্নরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,

"এইজন্য ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে

ঈশা বাস্যমিদং সর্বংযৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন করিয়া জানিবে এবং—

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং

তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসার যাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

* * * *

পরের শ্লোকে বলিতেছেন—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।

কর্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না; কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ইহাই স্মরণ করিয়া কর্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয়ঃ ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসার কর্মেরই উপাসনা করে তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবল ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্তব্যকর্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপর স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে ।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্মনির্বাহ ভাল তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহারপূর্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দ-সাধনের জন্য ব্রহ্ম-সম্ভোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্যই তাই। মঙ্গলকর্ম সাধনেই আমদের স্বার্থ প্রবৃত্তি সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ আমাদের হৃদগত বন্ধন-সকলের মোচন হইয়া থাকে—আমাদের যে রিপু-সকল মৃত্যুর মধ্যের আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গলকর্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্তব্যকর্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা—এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে—ইহার আর অন্যথা নাই, কর্মে লিপ্ত হইবেন না এমন পথ নাই।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।”

ইহাই সংসার ধর্মের মূলমন্ত্র—কর্ম এবং ব্রহ্ম, জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধন। কর্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন।” (উপনিষদ ব্রহ্ম, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৬৩১-৬৩২ পৃঃ)

কর্মের এই প্রেরণার মূলে রয়েছে আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা কবিকে নিছক অন্তর্মুখীন করতে সমর্থ হয় নি, জগতের মধ্যে সত্যের যে প্রকাশ তাই কবির অন্তর্জগতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আধ্যাত্মিকতার স্বরূপকে তিনি নিজেই উপনিষদীয় তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তা তাঁকে সংকীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ পরিবেশ এবং খণ্ড খণ্ড সত্যের উপলব্ধির সীমাকে অতিক্রম করে বৃহতকে জানার দিকে অনুপ্রাণিত করেছে। বাল্যকালে তাঁর চেতনা কিভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

"সেই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনই পক্ষীশিশু পক্ষীমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শলাভ করে, তখনই মানুষ সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কী আশ্চর্য সার্থকতা, কী অনির্বচনীয় আনন্দ, তা আমরা জানিনে কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাইনে!

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। সম্মুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীরভাবে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখিনে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখিনে—ইন্দ্রিয় দিয়ে, যুক্তি দিয়ে সংসার দিয়ে, স্বার্থ দিয়ে দেখি—তাকে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত-মানুষ বলেই দেখি—সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়, সেইখানেই দরজা

রুদ্ধ, তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারি নে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পরের হাত ধরে বলতঃ তুমি এসেছ।

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি। ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। এই সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের আত্মা সর্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে। সেই আত্মায় গিয়ে না পৌছলে সে দ্বারে এসে ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়—অমৃতং যদ্‌বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান, সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌছতে পারে না—সে আর সমস্তই দেখে, কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই—যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এই তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতনভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে—একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছে, আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, অল্পে অল্পে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছিনে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।"
(সংশয় নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ১০৩-১০৪ পৃঃ)

আধ্যাত্মিক সাধনার উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকেই রবীন্দ্রনাথ মানব-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তার একটি পরিপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায় 'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক প্রবন্ধমালার 'আত্মপ্রত্যয়' নামক প্রবন্ধে।

"আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আত্মা ; মানবকে এক বলে জানি সেই জানার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা ; বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন . সাধক 'আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরমজ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। এইজন্যই পরমাত্মাকে 'একাত্মপ্রত্যয়সারম্' বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম এককে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মায় আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।" (ঐ ২৬৭ পৃঃ)

বহির্বিশ্বের বাস্তব ঐক্যের বদলে কবি সেই ঐক্যের ভিত্তি খুঁজেছেন মানবাত্মায়। কিন্তু তাঁর সেই ভাববাদী তথা অধ্যাত্মবাদী বক্তব্যের মধ্য দিয়েও একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আত্মপ্রেম খোঁজে পরম ঐক্য এবং তার সন্ধান পায় মানবাত্মার, বিশ্বাত্মার তথা পরমাত্মার প্রেমে। অর্থাৎ কবি নিজের আমিত্বের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকার বদলে খুঁজেছেন বিশ্বমানবমনের সাথে ঐক্যের অনুভূতি। তারই মাধ্যমে তিনি পৌঁছাতে চান পরমাত্মার সাথে মিলনের আনন্দে। সেই সন্ধানের প্রেরণাই তাঁর কণ্ঠে বাণী পেয়েছে সর্বমানবের মিলন মন্ত্রেররূপে, সেই পথই তাঁকে টেনে এনেছে নিপীড়িত মানুষের স্বপক্ষে সংগ্রামের ক্ষেত্রে। কবি বলেছেন,

"অনন্তং ব্রহ্ম। অনন্ত বলেই ছোটো হয়েও বড়ো এবং বড়ো হয়েও ছোটো। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তো তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ

দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনিই আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন ; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার একসুরে বাঁধা ; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন ; এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব, মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানব-সম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনই একথা সত্য হয়েছে তখনই একথাও সত্য, অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই ; মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যেই ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। একদিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর একদিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয় ; একদিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-একদিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্মেররসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।" ('ছোটো ও বড়ো' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ)

কবি চেয়েছেন নিজ অন্তরে অনন্তের বোধকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে। উপনিষদের প্রভাব তাঁর মানসে যে প্রার্থনার রূপ নিয়েছে তার একটি অনবদ্য পরিচয় পাওয়া যায় নীচের ছত্রগুলিতে।

"মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুই ধারে তার নানা কল্যাণ কীর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই সমগ্র মানবের সমস্ত কালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি।" (ঐ, ৪৬৫ পৃঃ)

রবীন্দ্রপ্রতিভা এবং তার সুবিশাল সৃষ্টিকে ঐ দৃষ্টিতে বিচার করলে অনেক প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরাকরণ হয়। তাঁর যে সব সৃষ্টিকে মিষ্টিক, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে এক প্রহেলিকার আবরণে ঢেকে রাখার চেষ্টা হয় সেগুলির মর্মবাণী দিবালোকের মতই জ্যোতিষ্মানরূপে আমাদের সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

(৩)

উপনিষদের মানবতাবাদ

রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে উপনিষদীয় ঐক্যতত্ত্বকে মানব-সম্বন্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন তার আভাষ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি উপনিষদের শিক্ষার মানবতাবাদী দিকটির দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং বলিষ্ঠভাবে চেষ্টা করেছেন সেই দিকটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এ বিষয়ে তাঁর পূর্বসুরী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি রামমোহনের উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। উপনিষদীয় মানবতাবাদের মূল কথা হল সর্বমানবের ঐক্য এবং সর্বমানবে সমদৃষ্টি। প্রাচীনপন্থী প্রবক্তাদের দ্বারা এই দিকটি হয় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে নতুবা তাঁরা তাকে এক রহস্যময় বিমূর্ত তত্ত্বে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই মানবতাবাদী চিন্তাধারার যথার্থ তাৎপর্যের প্রতি আলাকসম্পাত করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রয়োগ করেছেন সমসাময়িক কালের বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে। তিনি স্বদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যাকে বিচার করেছেন ঐ জীবনদর্শনেরই মাপকাঠিতে। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টি দ্বিবিধ গুরুত্ব অর্জন করে। প্রথমত, রবীন্দ্রজীবনবেদ সম্বন্ধে সামগ্রিকধারণা লাভের পক্ষে তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, সেই আলোচনার মাধ্যমে আমরা উপনিষদীয় চিন্তা সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টি লাভ করবো।

বৈদিক যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র, জাদুশক্তিতে বিশ্বাস একদিকে যেমন মানুষের জ্ঞান এবং চিন্তার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে রেখেছিল তেমনি জীইয়ে রেখেছিল মানুষ ও মানুষের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। মানুষ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টিপাত করতে শেখেনি।

সেই অবস্থার তুলনায় একেশ্বরবাদ বিরাট অগ্রগতির সূচনা করলেও তা মানুষকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধে উঠতে সাহায্য করে না। একেশ্বরবাদ সমধর্মীয় মানুষের মধ্যে ঐক্যের বোধ জাগ্রত করে এবং উপজাতীয় চেতনার তুলনায় মানব-ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে ঠিকই। কিন্তু সেই ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ঐক্যবোধের মূলে থাকে অপরধর্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা এবং বিরূপ মনোভাব। সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানের প্রাচীর

সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। ব্রহ্মবাদ মানুষকে সাহায্য করে সেই সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে সার্বজনীন ঐক্যের ভিত্তিতে মিলিত হতে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন।

"যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সার্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বাঙ্গীন ঐক্য দিতে পারে—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি; সে এমন কিছুকে উদ্ভাবন করতে পারে না যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলেব চেয়ে বড়ো সৃষ্টি। সেইজন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হতেই যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।

বস্তুত এই ঐক্যের মূলে মানবজাতি এমন কিছুকে অনুভব করে যার প্রতি তার ভক্তি জাগে, যার জন্যে সে প্রাণ দেয়, যাকে সে দেবতা বলে জানে। মানুষ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন, অথচ তার অন্তরের মধ্যে পরস্পরের যোগের যে শক্তি নিয়ত কাজ করছে তা পরম রহস্যময়, তা অনির্বচনীয়; তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশে কালে বহুদূরে অতিক্রম করে চলে।

বিশেষ বিশেষ উপজাতি আপনার ঐক্যবন্ধনের গোড়ায় যে দেবতাকে স্থাপিত করেছে সেই দেবতাই বিশেষ সমাজের মধ্যে ঐক্য বিস্তার করলেও অন্য সমাজের বিরুদ্ধে ভেদবুদ্ধিকে একান্ত উগ্র করে তোলে। ধর্মের ঐক্যতত্ত্বকে সংকীর্ণ সীমায় স্থানিক রূপ দেবা মাত্রই তা বাহিবের সঙ্গে বিচ্ছেদের সাংঘাতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিভীষিকা অনেক আছে—ঝড়, বন্যা, অগ্নুৎপাত, মারী-কিন্তু মানুষের ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখা যায় ধর্মের বিভীষিকার সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। সর্বমানবের অন্তরতম যে গভীর ঐক্য, মানুষের ধর্মই তার সব চেয়ে বড়ো শত্রু ছিল এবং সেই—শত্রুতা যে আজও ঘুচে গেছে তা বলতে পারিনে।

তাই যুগে যুগে যাঁরা সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁদের সাধনা এই যে, দেবতা সম্বন্ধে মানুষের যে বোধ স্থানে রূপে ও ভাবে খণ্ডিত তাকে অখণ্ড করা; সাম্প্রদায়িক কৃপণতা যে ধর্মকে আপন আপন বিশেষ বিশ্বাস বিধি ও ব্যবহারের দ্বারা বদ্ধ করেছে, তাকে মুক্ত করে দিয়ে সর্বমানবের পূজাবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করা। যখনই তা ঘটে তখনই সেই ধর্মের উৎসবে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহবান ধ্বনিত হয়, সেই উৎসবক্ষেত্র কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে না। তখন ধর্মবোধের সঙ্গে যে অবাধ ঐক্যতত্ত্ব একাত্ম তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।" (ভারত পথিক রামমোহন রায় শীর্ষক প্রবন্ধমালা, রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৪০১-৪০২ পৃঃ)

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাকে রবীন্দ্রনাথ বিচার করেছেন এই দৃষ্টিতে। মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব বলতে তিনি বুঝেছেন মানুষের ঐক্যকে। সভ্যতা মানেই তাঁর কাছে একত্র হবার অনুশীলন। যেখানে যে কোনরকম অন্ধতায় এবং মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায় তার বিরুদ্ধে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়েছেন। সেই ঐক্যের আহবান কবি শুনতে পেয়েছেন উপনিষদের বাণীতে :

"ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে 'বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তবস্থঃ স্বসংবিদরূপবিদ্ বিদ্বান্'—নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তবস্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্।" (ঐ ৩৮৬ পৃঃ)

ঈশোপনিষদের সুবিখ্যাত প্রথম শ্লোকটিকে কবি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

"বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্যকেই দেবতা বলে পূজা করতেন। আবার উপনিষদের ঋষি সেই সূর্যকেই বলেছেন, 'হে সূর্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত করো, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ময় সত্যদেবতাকে দেখি'।

সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুকনা কেন, সেই সকলের আবরণভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্যকে অনাবৃত হতে আহবান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

সকলকেই দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে, তাঁর দান—ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই একক, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙালিকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন।" (ঐ, ৪১১-৪১২ পৃঃ)

তেমনি 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রটির মধ্যে তিনি একটি মানবতাবাদী তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন। ওর মধ্যে শুনেছেন সর্বমানবে সমদৃষ্টির বাণী।

"উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম; বিশ্ববিধাতার একটি রূপ আছে যা কেবলমাত্র সত্য, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্য বাণী নেই। তার পরবর্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং—সে কেবলমাত্র হওয়া নয়। সত্যবোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মনুষ্যত্বের বড়োপদবী লাভ হল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বুদ্ধির মোহমুক্ত বহুধা শক্তিকে প্রয়োগ না করে মানবত্বকে যেখানে অস্বীকার করেছি, সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত হই পরমাত্মায়, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তাঁর সামীপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-কথিত বাণীতে উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বসত্যকে স্বীকার করে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছাতে হবে।

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। আনুষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মভ্রষ্টতা হতে আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনালেন ঐক্যমন্ত্র যাতে চরম মানবসত্যের উপলব্ধি দ্বারা মানুষের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে।" (ঐ, ৩৯৪ পৃঃ)

এখানে কবি হৃদয়াবেগের বদলে জোর দিয়েছেন জ্ঞানের, মোহমুক্ত বুদ্ধির উপরে। নতুবা সত্যে পৌঁছান সম্ভব নয়, হৃদয়ে সেই সত্য উপলব্ধির অনুভূতি জাগাও সম্ভব নয়। সত্যে পৌঁছানর পথও সহজ নয়, অনেক কঠিন বাধার সাথে সংগ্রাম করে সে দিকে অগ্রসর হতে হয়। সে সংগ্রাম অসত্য, অন্যায়,

অজ্ঞানের বিরুদ্ধে এবং মানুষের অধিকারের স্বপক্ষে। কবি উপনিষদীয় শিক্ষাকে সেই সংগ্রামী তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন।

'অমৃতের পুত্র' কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি যা লিখেছেন তা বিশেষ ভাবে অনুধাবন যোগ্য। চারিদিকে মৃত্যুর সাক্ষ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঋষিরা বিশ্ববাসীকে আহবান করে বলেছিলেন যে তোমরা হলে অমৃতের পুত্র। সেই আহবানে রবীন্দ্রনাথ শুনেছেন মানুষের এগিয়ে চলার নির্দেশ, কল্পিত অধ্যাত্মলোকে নয়, এই পৃথিবীতে। অমৃতের সন্ধান জীবনকে তুচ্ছ করে নয়, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। কিসের জোরে? কবি সংশয়াতীতভাবে উত্তর দিয়েছেন যে সত্যের জোরে, মোহমুক্ত জ্ঞানের শক্তিতে। উপনিষদের ঋষি মানুষকে বলেছিলেন যে 'তোমরা দিব্যধামের অধিবাসী'। রবীন্দ্রনাথ 'দিব্যধাম' বলতে বুঝেছেন—সত্যের প্রকাশ।

"সেই দিব্যধামের আলো কোথা থেকে আসে? তমসঃ পরস্তাৎ। তমসার পরপার থেকে আসে। এই মৃত্যুর অন্ধকার সত্য নয়ঃ সত্য সেই জ্যোতি যা যুগে যুগে মোহের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আসছে। যুগে যুগে মানুষ অজ্ঞানের ভিতর থেকে জ্ঞানকে পাচ্ছে, যুগে যুগে মানুষ পাপকে মলিনতাকে বিদীর্ণ করে পুণ্যকে আহরণ করছে। বিরোধের ভিতর দিয়ে সত্যকে পাচ্ছে, এ ছাড়া সত্যকে পাবার আর-কোনো উপায় মানুষের নেই। যারা মনে করছে এই জ্যোতিই অসত্য, এই দিব্যধামের কথা কল্পনামাত্র, তাদের কথা যদি সত্য হত তবে মাটিতে মানুষ একদিন যেমন জন্মেছিল ঠিক তেমনিই থাকত—তার-আর কোনো বিকাশ হত না। মানুষের মধ্যে অমৃত রয়েছে বলেই না মৃত্যুকে ভেদ করে সেই অমৃতের প্রকাশ হচ্ছে?" ('অমৃতের পুত্র' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৪৬৮-৪৬৯ পৃঃ)

কবির কাছে বিকাশটাই বড় কথা। মানুষ অমৃতের পুত্র বলেই যে বিনা চেষ্টায় বিনা সংগ্রামে অমৃতত্বের মহিমা লাভ করবে তা নয়। তাই উক্ত প্রবন্ধেই পরমুহূর্তে কবি লিখেছেন।

"ভেবে দেখো, মানুষকে কি অমৃতের পুত্র করে তোলা সহজ। মানুষের বিকাশে যত বাধা ফুলের বিকাশে তত বাধা নেই। সে যে খোলা আকাশে থাকে; সমস্ত আলোকের ধারা, বাতাসের ধারা নিয়ত সেই আকাশ ধুয়ে দিচ্ছে—সে বাতাসে তো দূষিত বাষ্প জমা হয়ে তাকে বিষাক্ত করছে না। মুহূর্তে আকাশ-ভরা প্রাণ সেই বিষকে ক্ষালন করে দিচ্ছে, তাকে কোথাও জমতে দিচ্ছে না।

মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারিদিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে, কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে জমিয়ে তুলেছে। সে বলে, 'আকাশের আলোকে আমি বিশ্বাস করবনা, আমার ঘরের মাটির দীপকে আমি বিশ্বাস করব; আলোক নতুন কিন্তু আমার ওই দীপ সনাতন। তার শয়নগৃহে বিষাক্ত বাতাস জমা হয়ে রয়েছে; সেইটেতেই সে পড়ে থাকতে চায়, কেননা সে যে হল তার সঞ্চিত বাতাস, সে নতুন বাতাস নয়। ঈশ্বরের আলো, ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।" (ঐ, ৪৬৯ পৃঃ)

সংস্কারের আবর্জনার প্রতি এই মোহ ত' কেবল ব্যক্তির মনেই নয়, সমাজের ভিতরে সেই মোহই প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রগতির শক্তিকে এগিয়ে চলতে হয় সেই বাধাকে চূর্ণ করে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে কোন দ্বিধা নেই, কোন অস্পষ্টতা নেই। তিনি ঐ প্রবন্ধেই লিখে চলেছেন, "এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তার আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায় আকাশ ছেয়ে যায়, কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন করে?

চিরদিন এমনি করে সত্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে মানুষ। মানুষের নিজের হাতের গড়া জিনিসের উপর মানুষের বড়ো মোহ—সেইজন্য মানুষ নিজের হাতেই নিজে মার খায়। মানুষ নিজের হাতে নিজেকে মারবার গদা তৈরী করে। সেইজন্য আজ সেই নিজের হাতের গড়া গদার আঘাতে রাজ্য সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি আজ বলছে 'ধর্মবুদ্ধির কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আমি গায়ের জোরে সব কেড়েকুড়ে নেব।' সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্ম গ্রহণ করে; সে ধর্ম-যে সবল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু, মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র। সেইজন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে স্বার্থের ধর্ম, যা তার পরধর্ম, তাকে ধূলিসাৎ করতেই হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে।" (ঐ)

ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে যেখানেই মানব ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়েছে কবির বজ্রকণ্ঠ প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের সেই সংগ্রামী মানবতাবাদ সুপরিচিত এবং বিশ্ববন্দিত। কিন্তু উপনিষদীয় চিন্তাকে তিনি কিভাবে সেই সংগ্রামের স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন তা বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ যেখানে খণ্ডিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে সেখানেই কবি দেখেছেন মানুষের অবমাননা এবং তার বিরুদ্ধে তিনি ক্ষমাহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। "অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেছেন তিনি কবে চলবে বলে কারও জন্যে অপেক্ষা করবেন না। যে বসে রয়েছে সে কি দেখতে পাচ্ছে না তার বন্ধন? সে কি জানে না যে এই বন্ধন না খুলে ফেললে সে মুক্ত হবে না, সে সত্যকে পাবে না? সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেছি, এমন কথা কে বলে! অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে! তুমি যতো বড়ো মুগ্ধ হও-না কেন, তোমার মোহ অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেলবে, এত বড়ো স্পর্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে!

সত্যকে হাজার হাজার বছর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চলতে বাধা দিয়েছি, তাকে বলেছি, 'তোমার আসন এইটুকুর মধ্যে, এর বাহিরে নয়। তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ো না, তুমি সমুদ্র পেরিয়ো না।' সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব, মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর—এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না! মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে, সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না! তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন! তিনি কি বলতে পারেন যে তিনি বন্দী! তিনি একথা বললে সংসারকে কে বাঁচাবে! তিনি বলেছেন 'সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত'। এই উদ্‌বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র—এখনই নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে; অনন্তকাল জাগ্রত থেকে তারা সেই জ্যোতির্ময় মন্ত্র উচ্চারণ করছে, জপ করছে এই মন্ত্র সেই চিরজাগ্রত তপস্বীরা। জাগ্রত হও, জাগ্রত হও। প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখবার চেষ্টা করো না। সত্য তাহলে নিদারুণ হয়ে উঠবে,

যে লোহার শৃঙখল তার হাতকে বাঁধবে সেই শৃঙখল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি? সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্চ্ছিত হয় নি? অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন, বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয় মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে। সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে। বসে থাকবার নয়, কোণের মধ্যে তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকবার নয়—চলবার, ভাঙবার ডাক এসেছে।" ('যাত্রীর উৎসব' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৪৭৩-৪৭৪ পৃঃ)

মোহ এবং মূঢ়তার দ্বারা সত্যের চারিদিকে প্রাচীর গড়ে তোলার চেষ্টার ফলে দেখা দেয় মানুষের মনে ও সমাজে বিকৃতির অভিশাপ। সেই সম্বন্ধে কবি বলেছেন,

"অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এই জন্যেই মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্ছে তার আর সীমা সংখ্যা নেই। সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়, বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডীর বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবি করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে; মানুষ যখন বড়ো বড়ো দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে; কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এবং মনে করি, যারা আমাদের দলের নামটুকু না ধারণ করেছে তারা ঈশ্বরের

ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে—এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মতো কোনো পূর্বপিতামহের নয় নিজের জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা বয়ে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু, তবু এই সমস্ত বিকৃতিও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্মের সত্যরূপ নিত্যরূপে ব্যক্ত হয়ে উঠছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করছে। অবশেষে এই কথা উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়; মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি।" (ছোটো ও বড়ো, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৪৬১-৪৬২ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ শুধুমাত্র ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং অন্ধতার বীভৎস দিকগুলির বিরুদ্ধেই সীমিত নয়। ধর্ম যেখানে মানুষে ও মানুষে মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধে কবি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

"ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড় হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্যে কৃচ্ছ্রসাধনাকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচার-বিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে আবদ্ধ করে রাখে; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে—এইজন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম বলে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় বলেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এইজন্যে আপনার ধর্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে; ধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজও ধর্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই

পৃথক করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল, বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্ত নিয়ম সংযম প্রধানত তারই প্রতিকারের প্রবল প্রচেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলই দূর করছে, কেবলই ভাগ করছে, নিজেকে কেবলই সংকীর্ণ বদ্ধ করে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করছে। হিন্দুর ধর্ম যেখানে সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলই বেড়া এবং প্রাচীর।" ('রসেরধর্ম', রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৩৩২ পৃঃ)

ধর্ম বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝেছেন তা বিভিন্ন প্রবন্ধে বিভিন্নভাবে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছেন। অন্যত্র সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে। বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনার সুবিধার জন্য তাঁর মতামতের একটি প্রতিনিধিত্ব মূলক নিদর্শন নীচে উদ্ধৃত করা হল।

"ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়; অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তো জলে স্থলে আকাশে, অন্নে পানে, বাক্যে মনে, সর্বত্র সর্বদাই এই অনন্তকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করে নি।

এই-যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ—কাল্পনিকতা নয়; তারই সাধনা প্রচার করবার জন্যে এদেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি
ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।" ('বিশ্ববোধ', রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৩২৩-৩২৪ পৃঃ)

ঐ প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন,

"ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোট করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানা দিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ এসেছে। জিগীষা নয়; জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়—বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়—ছোটোবড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায়, তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন, যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো।" (ঐ, ৩২৪ পৃঃ)

কবি বলেছেন যে এইভাবে প্রতিদিন বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলার দ্বারা আমরা মহতী বিনষ্টির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি। সেই প্রত্যক্ষ বিনষ্টি থেকে বাঁচার উপায় কি? প্রশ্নের উত্তর আমাদের দেশেই আছে অর্থাৎ ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি। তাঁকে কেমন করে জানতে হবে? ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য।

"প্রত্যেকের মধ্যে, সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে, তাঁকে দর্শণ করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই, যে পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্য সকল দেশেই সর্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে; সেই বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে—কেননা সেই একই অমৃত, সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।" (ঐ, ৩২৫ পৃঃ)

এই প্রসঙ্গে কবি উপনিষদের আর একটি বাক্যের মানবতাবাদী তাৎপর্যকে তুলে ধরে বলেছেন।

"যস্তু সর্বানি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

* * * *

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বানিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে, কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি 'সর্বগতঃ শিবঃ', যিনি 'সর্বভূত-গুহাশয়', যিনি 'সর্বানুভূঃ'। তাঁকেই চাই; তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে।" (ঐ, ৩২৬ পৃঃ)

অতীত ইতিহাসে দেখা যায়, যেমন ধর্মের নামে মানুষেও মানুষে সহস্র ব্যবধান গড়ে তোলা হয়েছে, তেমনি দেখা যায় যে সেই ব্যবধান ভাঙার তাগিদ যখন আত্মপ্রকাশ করেছে তখন তা ধর্মের আবরণের মধ্য দিয়েই মাথা তুলেছে। যেখানে এই ধরণের বেড়া ভাঙার প্রয়াস হয়েছে তাকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানিয়েছেন। উক্ত 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন,

"ধর্ম আন্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনই সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা য়িহুদি ধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতিব স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষেব সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে। কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি—তার মৈত্রী, তার করুণা, এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসাবই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই—রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে নিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছে।" (ঐ, ৩৩৩ পৃঃ)

উপনিষদে যে চিন্তার-উন্মেষ দেখা যায় তা পরবর্তী কালে ক্রমশঃ ভারতীয় চিন্তাব বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে একটা সুমহান উদার মানবতাবাদী মূলসুর হিসাবে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। বর্ণ- সম্প্রদায় ধর্ম, আচার বিচার, বিধিনিষেধ প্রভৃতি সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান ও ভেদাভেদেব গণ্ডীকে অতিক্রম করে সেই মূল সুরটি সমস্ত মানুষের ঐক্যের সত্যটিকে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা কবেছে। মানব-সত্যেব উপলব্ধির এই প্রচেষ্টা ভারতইতিহাসের বিভিন্ন যুগের ভিতব দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। যুগে যুগে মানুষের হাতে মানুষের অবমাননার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এই ধারাকে অনেকে ভারতের সাধনার ধারা আখ্যা দিয়ে থাকেন। মধ্যযুগে সন্তকবি কবীর তাকে 'ভারত-পন্থ' আখ্যা দিয়েছিলেন। সেই মর্মবাণীকেই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতপথ' রূপে অভিহিত করেন এবং রামমোহন রায়কে 'ভারতপথিক' আখ্যা দেন। ভারতপথ বলতে তিনি যা বুঝেছেন তা ব্যাখ্যা করেছেন নানা প্রবন্ধে।

"পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা

বাধা বিপত্তি দুর্গতি সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।" (ভারতবর্ষের ইতিহাস, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ১০৩২ পৃঃ)

নানাকে এক করার সমস্যা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সামনে এসেছে অতিদূর প্রাচীনকাল থেকে। এখানে বহু বিচিত্র এবং বিভিন্ন মানবিক উপাদানের সংস্রব ঘটেছে। কবি লিখেছেন,

"মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়? যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়। —মানবসমাজের সর্ব-প্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলন। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন ঘটেনি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক্, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।" (ভারতপথিক রামমোহন রায়, রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৩৮৪-৩৮৫ পৃঃ)

কবি বলেন, ভারতবর্ষ সেই কঠিন সাধনায় একদিন সিদ্ধিলাভ করেছিল, কেন না সে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সংকীর্ণতার ঊর্ধে উঠে, বহমান চিত্ত নিয়ে।

"যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদবিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণকরে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মননধারা। সে

বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক, সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি—এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রন জানাবার। যে তারা জ্যোতির্হীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চন রূপে অকিঞ্চিৎকর।" (ঐ, ৩৮৩ পৃঃ)

ভারতের সেই সাধনার ধারাকে রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়নের চেষ্টা করেছেন পরিবর্তনশীল ইতিহাসের পটভূমিতে। তাঁর সে চেষ্টার স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন রচনার ভিতরে। 'মানুষের ধর্ম' বইটিতে তিনি বলেছেন,

"বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—

অথ যোহন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে
অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।

যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা যে ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই। অর্থাৎ, সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার বাইরে বন্দী করে রাখে; তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত।

এই যেমন শোনা গেল উপনিষদে, আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে মনের মানুষ 'মনের মাঝে করো অন্বেষণ'।

মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা কাঠ-পাথর পূজাকে বলেছে হীনতা এবং তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটে। স্বীকার করি কাঠ-পাথর বাইরের জিনিস, সেখানে সর্বকালের সর্বমানুষের পূজা মিলতে পারে না। মানুষের ভক্তিকে জাতিতে জাতিতে প্রথায় প্রথায় সেই পূজা বিচ্ছিন্ন করে, তার ঐতিহাসিক গণ্ডীগুলি সংকীর্ণ।

কিন্তু, তাদের বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতোই বাইরে অবস্থিত, নানা প্রকার অমানুষিক বিশেষণে সজ্জিত—শুধু তাই নয়, বিশেষ

জাতির ঐতিহাসিক কার্যকলাপে জড়িত ও কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা দৈশিক কালিক বিশেষত্বগ্রস্ত। এই পৌত্তলিকতা সূক্ষ্মতর উপাদানে রচিত বলেই নিজেকে অপৌত্তলিক বলে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্যিকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, যে দেবতাকে আমার থেকে পৃথক করে বাইরে স্থাপন করি তাঁকে স্বীকার করার দ্বারাই নিজেকে নিজের সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দিই।" (রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৫৯৫ পৃঃ)

এই নিজের সত্য আর ক্ষুদ্র আমিত্ব বা সংকীর্ণ স্বার্থ—এক জিনিষ নয়। উক্ত প্রসঙ্গেই কবি বৃহদারণ্যক উপনিষদের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করেছেন।

"এমন তরো কথায় একটা ক্রুদ্ধ কলরব উঠতে পারে। তবে কি মানুষ নিজেকে নিজেই পূজা করবে। নিজেকে ভক্তি করা কি সম্ভব। তাহলে পূজা-ব্যাপারকে তো বলতে হবে অহংকারের বিপুলীকরণ।

একেবারে উলটো। অহংকে নিয়েই অহংকার। সে তো পশুও করে। অহং থেকে বিযুক্ত আত্মায় ভূমার উপলব্ধি একমাত্র মানুষের পক্ষেই সাধ্য। কেন না মানুষের পক্ষে তাই সত্য। ভূমা আহারে বিহারে আচারে-বিচারে ভোগে নৈবেদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয়। ভূমা বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে। বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা। সেইজন্যেই কথিত আছে; নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। তারা সত্যকে অন্তরে পায় না যারা অন্তরে দুর্বল। অহংকারকে দূর করতে হয়। তবেই—অহংকে পেরিয়ে আত্মাকে পৌঁছতে পারি।

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহবিজিঘৎ

সোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।

আমার মধ্যে যে মহান আত্মা আছেন, যিনি জরামৃত্যুশোক-ক্ষুধাতৃষ্ণার অতীত, যিনি সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁকে জানতে হবে। 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ'। এই যে তাঁকে সন্ধান করা, তাঁকে জানা, এতো বাইরে জানা, বাইরে পাওয়া নয়; এযে

আপন অন্তরে আপনি হওয়ার দ্বারা জানা, হওয়ার দ্বারা পাওয়া।” (ঐ ৫২৫-৫২৬ পৃঃ)

কবি সেই আত্মাকে জানার পথ খুঁজেছেন নিখিল মানবতার সাথে ঐক্যবোধের মাধ্যমে। উপনিষদের উপরোক্ত বক্তব্যকে তিনি সেইভাবেই বুঝেছেন এবং বোঝাতে চেয়েছেন।

“প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ। যুক্তিতর্কের যোগে বাহ্যজ্ঞানের বিষয়কে যেমন করে জানি এ তো তেমন করে জানা নয়, অন্তরে হওয়ার দ্বারা জানা। নদী সমুদ্রকে পায় যেমন করে, প্রতিক্ষণেই সমুদ্র হতে হতে। একদিকে সে ছোটো নদী, আর একদিকে সে বৃহৎ সমুদ্র। সেই হওয়া তার পক্ষে সম্ভব, কেননা সমুদ্রের সঙ্গে তার স্বাভাবিক ঐক্য; বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে সেই ঐক্য। জীবধর্ম যেন উঁচু পাড়ির মতো জন্তুদের চেতনাকে ঘিরে আটক করেছে। মানুষের আত্মা জীবধর্মের পাড়ির ভিতর দিয়ে তাকে কেবলই পেরিয়ে চলেছে, মিলেছে আত্মার মহাসাগরে, সেই সাগরের যোগে জেনেছে আপনাকে। যেমন নদী পায় আপনাকে যখন সে বৃহৎ জলরাশিকে আপন করে, নইলে সে থাকে বদ্ধ হয়ে, বিল হয়ে, জলা হয়ে। তাই বাউল মানুষকে বলেছে, ‘তোরই ভিতর অতল সাগর’। পূর্বেই বলেছি, মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে জ্ঞান পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেইজন্যে তা শ্রদ্ধেয়। তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা-আমির কর্মই বন্ধন, সকল-আমির কর্ম-মুক্তি।

আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে—

মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।
একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই।

সেই মনের মানুষ সকল-মনের মানুষ, আপন মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ্ বলেছেন; যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। বলেছেন; তং বেদ্যং পুরুষং বেদ। যিনি বেদনীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনায় যাঁকে জানা যায় তাঁকে সেই বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে নয়।” (ঐ ৫২৬ পৃঃ)

বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল মানুষের জয়গান। অথর্ববেদের সেই ঘোষণার কথা উল্লেখ করে কবি বলেছেন, "অথর্ববেদ বলেন: তস্মাদ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে। যিনি বিদ্বান তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্। যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে, তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই।" (ঐ ৫৯৮-৫৯৯ পৃঃ)

'মানুষের ধর্ম' বইটিতেই অন্যত্র কবি বলেছেন, "ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ববেদ বলেছেন সে কোনো একটিমাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং সমস্ত তার অন্তর্গত। মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটি মাত্র বিন্দুতে সংহত করে নিশ্চল করলে হয়ত তার আত্মভোলা একটা আনন্দ আছে। কিন্তু, ততঃ কিম্, কী হবে সেই—আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানবসংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পাবে না। একটিমাত্র প্রদীপ অন্ধকারে একটুমাত্র ছিদ্র করলে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না। সমস্ত অন্ধকারের অপসারণে রাত্রির অবসান। সেইজন্যে মানুষের মুক্তি যে মহাপুরুষেরা কামনা করেছেন তাঁদেরই বাণী সম্ভবামি যুগে যুগে। যুগে যুগেই তো জন্মাচ্ছেন তাঁরা দেশে দেশে। আজও এই মুহূর্তেই জন্মাচ্ছেন, কালও জন্মাবেন। সেই জন্মের ধারা চলেছে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, এই বাণী বহন করে—সোহহম্।" (ঐ, ৬০১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের মতে বুদ্ধদেব সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন। তাই তিনি (বুদ্ধদেব) বলেছিলেন,

"মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তমনুরকখে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমানং।"

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমান দয়াভাব জন্মাবে।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের বাণীর মানবতাবাদী দিকটিকেই প্রাধান্য দেন। কোন্ দৃষ্টিতে এবং কোন পদ্ধতিতে বিচার করলে সেই দিকটি বড় হয়ে দেখা

দবে সে সম্বন্ধে তিনি ঈঙ্গিত করে গেছেন। "বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না—যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তার আসল পরিচয়। যদি দুঃখ-দূরই চরম কথা হয় তাহলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়-কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য—আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে—বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়—এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে।

* * *

সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলেছেন। জগতে যে আনন্দ বিরাজমান তারও যে ওই প্রকৃতি—সে যে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাসিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন—নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চারদিকে ভিড় করে আসত না।"
(বুদ্ধদেব নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, একাদশখণ্ড, ৪৯০ পৃঃ)

বুদ্ধের শিক্ষার সেই ইতিবাচক দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কবি বারবার চেষ্টা করেছেন। তার ঐতিহাসিক ভূমিকাটিকে তুলে ধরেছেন যথাযথভাবে। ভারতের চিন্তার বিকাশে তার অবদান অসামান্য।

"ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে *দীন* দৈবাধীন হীন পদার্থ

নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।" (বুদ্ধদেব শীর্ষক প্রবন্ধমালা, রচনাবলী, একাদশখণ্ড, ৪৮৭ পৃঃ)

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমান মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে—একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এতো বড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। যে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।" (ঐ ৩৯৩-৪৯৪ পৃঃ)

বুদ্ধের এই অবদানকে কবি দেখেছেন উপনিষদের মানবতাবাদী চিন্তাধারারই অগ্রগতি হিসাবে। উপনিষদে যার উন্মেষ হয়েছে, যার একটি রূপরেখা গড়ে উঠেছে অথচ তখনও পূর্ণাবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে নি তারই শক্তিশালী অভিব্যক্তি হয়েছে বুদ্ধের বাণীতে। উপরোক্ত 'বুদ্ধদেব' শীর্ষক প্রবন্ধমালাতেই কবি মহামানবের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলেছেন যে মানুষের প্রকাশ সত্যে এবং যিনি উপনিষদের শিক্ষানুযায়ী সকলের মধ্যে আপনাকে এবং আপনার মধ্যে সকলকে দেখতে পান তিনিই সত্যকে জানেন। তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়, তিনি হন আপন মানবমহিমায় দেদীপ্যমান। তিনি তখন লোকসাধারণের সামনে সেই সত্যকে তুলে ধরেন।

"মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হত কোনো প্রকাশবান্ মহাপুরুষের মধ্যে? মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে—আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশ-কালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন্ সদ্য প্রয়োজন-সিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-

ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা, বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এই জন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণাবাক্য অক্ষয় রূপ নিল মরুপ্রান্তরে, প্রস্তরমূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধবন্দনা, মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোকসামান্য দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে, নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তরখণ্ড-গুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্পপ্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্প সম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বতকালকে এই মন্ত্র দান করে গেল: বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি।" (ঐ, ৪৭০-৪৭১ পৃঃ)

বুদ্ধের মানবতাবাদী অবদানের আরো একটি তাৎপয ধরা পড়েছে রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টিতে। তা হল বৌদ্ধধর্মে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা। "বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষেব নয়, অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে। জাতক কাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে; তাতে বলেছে, যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্যে দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণিজগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দ'র ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই মৈত্রী অল্প অল্প করে নানাদিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি।

* * * *

জাতক কথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যে এতো বড়ো মন্দির-ভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।" (রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৪৯৩ পৃঃ)

ভারতের সামাজিক জীবনে ও জীবনদর্শনে বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের বিরাট প্রভাব চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বুক থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বটে কিন্তু মানুষের চিন্তাজগতে তার সেই প্রভাব মুছে যাওয়ার জিনিস নয়। আর্যভাষী ও এদেশে আদি অধিবাসীদের মধ্যে যে বিরোধ চলেছিল তার মাঝখানে মানুষে মানুষে মিলনের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয় বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধযুগে শুধু সেই সব বিরুদ্ধ মানবগোষ্টির মাঝ-খানকার বেড়াগুলিই একধর্মের বন্যায় ভেসে যায় নি, বাইরের নানা মানুষ সেই ধর্মবন্যার আহ্বানে এসে ভারতবাসীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সেই সংমিশ্রণ ও সম্মিলনের পরিণতি হয় নবহিন্দুধর্মে। নব হিন্দুধর্মের উপরের তলায় দেখা দিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু নীচের তলায় বুদ্ধের মানবতা-বাদী শিক্ষা ফল্গুধারার মত সঞ্চারিত হয়ে তার প্রাণশক্তি যুগিয়েছে। এইদিকে কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, "এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, 'সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি—যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি মুহূর্তের সুখ-দুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব-হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মানুষের ক্ষুদ্র কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহ প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা, অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটবড়ো ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল;

প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছ।" (বুদ্ধদেব প্রসঙ্গ, রচনাবলী একাদশ খণ্ড, ৪৮৭ পৃঃ)

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন ইস্‌লাম ধর্ম এদেশে আসে তখন হিন্দুধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে সংঘাত মানুষে মানুষে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। তার চরিত্র এবং কারণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন যে সেই বিরোধই একমাত্র সত্য নয়। নিদারুণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিবেশের মধ্যেই এমন সব সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সেই প্রয়াসের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ভারতের মর্মবাণী। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে লিখেছেন

"ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন মুসলমান বাহির থেকে এল তখন সেই সংঘাতে দুই ধর্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্মের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাতে মানুষে মানুষে শান্তি না এনে নিদারুণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্যদান করে নি, তাকে শতধা বিভক্ত করে তাব বল হরণ করেছে। মুসলমান-ধর্ম আপন সম্প্রদায়কে এক করা দ্বারা বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবোধ নিদয়ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তরতর ঐক্যকে উপলব্ধি করে নি। বাইরের দিক থেকে আঘাত কবে মুসলমান মানুষের বাহ্যরূপের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্মের বাহ্যরূপের বেড়াকে বহুগুণিত করে হিন্দু, মানুষে মানুষে যে বাহ্যভেদ আছে তার উপর স্বয়ং ধর্মের স্বাক্ষর দিয়ে, তাকে নানা বিধিবিধান ও সংস্কারের দ্বারা আটঘাট বেঁধে পাকা করে দিয়েছিল। সেদিন এই দুই পক্ষে ধর্মবিরোধের অন্ত ছিল না—আজও সেই বিরোধ মিটতে চায় না।

সেদিন ভারতে যে-সব সাধক জন্মেছিলেন তাঁরা ভেদবুদ্ধির নিদারুণ প্রকাশ দেখেছেন। তাই মানুষের চিরকালীন সমস্যার সমন্বয় করবার জন্যে তাঁদের সমস্ত মন জেগেছিল। এই সমস্যা হচ্ছে, ধর্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু স্থাপন করা। সে কেমন করে হতে পারে? না, সকল ধর্মের বাহিরে দেশকালের আবর্জনা জমে উঠে তার সাম্প্রদায়িকরূপকে কঠিন করে তোলে, সে দিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে

অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই বাধা নেই। এক কথায় অবিদ্যার মধ্যেই বাধা অজ্ঞানের বাধা। যেখানে কোনো এক শাস্ত্র বলে, বাসুকির মাথার উপরে পৃথিবী স্থাপিত, সেখানে আর এক শাস্ত্র বলে, দৈত্যের কাঁধের উপর পৃথিবী স্থাপিত; এই মতভেদ নিয়ে আমরা যদি খুনোখুনি করি তবে সেই অজ্ঞানের লড়াই বাইরের দিক থেকে কিছুতেই মিটতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিরোধ মেটে এইজন্যে যে, সেখানে বিশ্বাসের যে আদর্শ সে সার্বজনীন বুদ্ধি; সে প্রথাগত বিশ্বাস নয়, লোকমুখের কথা নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে, সাম্প্রদায়িক প্রথার মধ্যে নেই। সেইজন্যে ভারতবর্ষের ঐক্যসাধক ঋষিরা সকল ধর্মের মূলে যে চিরন্তন ধর্ম আছে তাকেই ভেদবোধপীড়িত মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। শাস্ত্র সাময়িক ইতিহাসের; আত্মপ্রত্যয় চিরকালের। শাস্ত্র ভেদ ঘটায়, আত্মপ্রত্যয় মিলন আনে। দাদু, কবীর নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা ধর্মের শাস্ত্রীয় বাহ্যরূপের বাধা ভেদ করে পরম সত্যের আধ্যাত্মিক রূপকে প্রচার করেছিলেন। সেইখানেই সকল বিরোধের সমন্বয়।" (ভারতপথিক রামমোহন রায়, রচনাবলী, একাদশখণ্ড, ৪০৩-৪০৪ পৃঃ)

ঐ সাধকদের একজন ছিলেন রামানন্দ। তাঁর সম্বন্ধে কবি বলেছেন, "একদিন ব্রাহ্মণ রামানন্দ তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিনকার সমাজ তাঁকে জাতিচ্যুত করলে। কিন্তু তিনি একাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানবের। সেদিন ব্রাহ্মণমণ্ডলীর ধিক্‌কারের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে রামানন্দই বলেছিলেন সোহহম্; সে সত্যের শক্তিতেই তিনি পার হয়ে গিয়েছিলেন সেই ক্ষুদ্র সংস্কারগত ঘৃণাকে যা নিষ্ঠুর হয়ে মানুষে মানুষে ভেদ ঘটিয়ে সমাজস্থিতির নামে সমাজধর্মের মূলে আঘাত করে।" (মানুষের ধর্ম, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৫৯৮ পৃঃ)

তেমনি অন্যদের সম্বন্ধে কবি লিখেছেন,

"সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর একজন ছিলেন দাদূ। তিনি বলেন—

ভাই রে ঐসা পংথ হমার

দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পুরা অবরণ এক অধারা

ভাইরে, আমার পথ এইরকম, সে দুইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, এক। তিনি বলেছেন—

জাকৌ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ,

জাকৌ তারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ।

যাকে আমরা মারি সেই আমাদের ফিরে মারে, যাকে ত্রাণ করি সেই আমাদের ফিরে ত্রাণ করে।

তিনি বলেছেন,—

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।

সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব, তিনি বলেন—

বুংদ বুংদ মিলি রস সিংধহৈ, জুদা জুদা মরু ভায়।

অর্থাৎ বিন্দুব সঙ্গে বিন্দু যখন মেলে তখনই হয় রসসিন্ধু, বিন্দুতে বিন্দুতে যখন পৃথক হয়ে যায় তখনই মরুভূমি প্রকাশ পায়।

এই রজ্জব বলেন—

হাথ জোড়ুঁ গুরু সূঁহোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।

গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দুমুসলমান মিলে যায়।

এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভরেতের পথ।"

('ভারতপথিক রামমোহন রায়,' রচনাবলী, একাদশখণ্ড, ৩৮৬ পৃঃ)

সেদিন এই মিলনের সাধনায় সমাজে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা অগ্রসর হন নি সত্য কিন্তু নীচের স্তরের মানুষের ভিতরে সেই মহান্ প্রচেষ্টা সুরু হয়েছিল। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে কবি লিখেছেন,

"হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয়পক্ষের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল; নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্মও আচার লইয়া ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জস্য-

স্থাপনের প্রক্রিয়া বন্ধ হয় নাই।” (“স্বদেশীসমাজ,’ রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৬৯৯ পৃ:)

সেই ভারতপথ অগ্রসর হয়ে চলেছে বাংলার বৈষ্ণব কবি ও সাধকদের মধ্য দিয়ে, যার বিরাট মহিমাময় অভিব্যক্তি হয়েছে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বে। এই ধারার অগ্রগতি সম্বন্ধে কবি লিখেছেন,

“আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্তভাগে ছিল, তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই, সকলেই আপন-আপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল—তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল—

‘মার খেয়েছি না হয় আরও খাব।
তাই বলে কি প্রেম দিব না? আয়।’

* * * *

আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিনী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বিরহিনীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।” (‘চিঠিপত্র’, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৬৬৪-৬৬৫ পৃঃ)

সেই ধারাই বহন করে চলেছে বাংলার অশিক্ষিত বাউল সম্প্রদায়। রবীন্দ্রনাথ তাদের বসিয়েছেন উপনিষদের ঋষিদের সাথে সমান মর্যাদার আসনে।

রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ভারতের সাধনা বা ভারতপথ সেই ধারাকে যুগে যুগে কঠিন সংগ্রাম করে এগিয়ে চলতে হয়েছে। ধর্মের গোড়ামি এবং

মানুষের অবমাননার বিরুদ্ধে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। কবি বলেছেন যে এই ভারতেই আবার কথায় কথায় পদে পদে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সর্ববিষয়েই মানুষের প্রতি ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে জগতের অন্য কোথাও তার তুলনা পাওয়া যায় না। তাই এখানে ঐ দুইটি পরস্পর বিরোধী ধারার সংঘাত চলেছে বিরামহীন ভাবে। চিন্তার ক্ষেত্রে সেই সংঘাত যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সে সম্বন্ধেও কবি নানা প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁর জীবনদৃষ্টির প্রকাশ হিসাবে সেই আলোচনা যথেষ্ট মূল্যবান। 'সামঞ্জস্য' নামক প্রবন্ধে তিনি লেখেন,

"একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র পড়ে, কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধি-লাভ করতে পারে এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল; তখন মন্ত্র ও অনুষ্ঠানই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল—কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান-নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। এক দিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল; জ্ঞান ও হৃদয়বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করে নি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার হতে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তারপরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি জুড়ে বসল; দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমন কি ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্য বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।" (রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৩৭০ পৃঃ)

সত্য সাধনার লক্ষ্য পরিপূর্ণতার দিকে, কখনই প্রমত্ততার দিকে নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন যে এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করার অভিপ্রায়ই

উপনিষদে প্রকাশ পেয়েছে এবং ভগবদ্‌গীতায় তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি যেমন বৌদ্ধধর্মের শিক্ষার ইতিবাচক দিকটিকে তুলে ধরেছেন তেমনি তার নেতিবাচক দিকটিকে সমালোচনা করতে কুণ্ঠিত হন নি। উক্ত প্রবন্ধেই তিনি এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।

"মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করল। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই; কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে সমস্ত ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে, তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো সেই দিন থেকে সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো—সেইদিন থেকে প্রাচীন তপস্যাশ্রমের স্থানে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে, শরীরের প্রাণক্রিয়াকে আবদ্ধ করে, একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহ-মন-হৃদয়-বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলছে তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাদের কথা ছিল, কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য এবং সত্যকে পেতে

গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে হয়।

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসার-যাত্রার মধ্যে, এত বড়ো একটা বিচ্ছেদ কখনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না—কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধর্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে হৃদয়-পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার অনধিকারেব বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখতে দেখতে একেবারে চতুর্দিক প্লাবিত করে দিলে, অনেক দিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠল।" (ঐ, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৩৬৮-৩৬৯ পৃঃ)

যেমন চিন্তার ক্ষেত্রে, তেমনি সমাজজীবনের ক্ষেত্রে যে সব নেতিবাচক দিক প্রাধান্যলাভ করেছিল তাকে রবীন্দ্রনাথ কখনও ক্ষমা করেন নি। বহুশতাব্দী ধরে এখানে চলেছে আত্মবিচ্ছেদের যে গুরুতর উচ্ছৃঙ্খলা, তার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন উপনিষদীয় ঐক্যবোধের তত্ত্বটিকে সামনে তুলে ধরে। কবি তাই লিখেছেন,

"অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং একথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্য স্থূলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধে, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভাবতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে।

এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বতবাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিনন্দন-গান সামাজিক জড়পুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছে, 'ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণ'—হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও।" ('ভারতপথিক রামমোহন রায়, রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৩৮৬ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রামমোহন ভারতের যথার্থ পথের পথিক হিসাবে মানবাত্মার মিলনের ধর্মের আদর্শে সংযুক্ত মানুষের এক মহৎরূপ দেখেছিলেন। তিনি যে উদার প্রশস্ত পন্থায় সকলকে আহবান করেছিলেন তাতে হিন্দুমুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। রামমোহনের অবদানের কথাকে রবীন্দ্রনাথ বিমূর্ত বা অবচ্ছিন্ন ভাবে আলোচনা করেন নি। তিনি রামমোহনের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

"আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্টকরে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহবান সে সুমহৎ ঐক্যের আহবান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দুমুসলমান খৃস্টান কারও স্থান-সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।" ('ভারতপথিক রামমোহন রায়, রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৩৮৭ পৃঃ)

কবি যে ভাবে রামমোহনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তার মাধ্যমে আমরা কবির নিজের চিন্তাধারা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সমর্থ হই। তাঁর বক্তব্যেব বিস্তৃত আলোচনা এক্ষেত্রে আদৌ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে রামমোহন রায় হলেন চিরকালের মত আধুনিক। তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তাঁর এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালে তা আবদ্ধ হয়ে নেই। তার অন্যদিক ভারতেব সুদূর ভাবীকালের দিকে প্রসারিত।

"তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেবেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহাইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দুমুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।" (ঐ, ৩৮৮ পৃঃ)

রামমোহনের ভূমিকা এবং কৃতীর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন তাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, রামমোহন ভারতের নবজাগরণের দীপশিখা প্রজ্বলিত করেছিলেন এদেশেরই সুমহান্ চিন্তাসম্পদের সাহয্যে। দ্বিতীয়ত, তাঁর সেই প্রচেষ্টা আর অতীতমুখীনতা এক

জিনিষ নয়। তিনি জাতীয় ঐতিহ্যের জীবন্ত এবং ইতিবাচক দিকগুলিকে গ্রহণ এবং যুগোপযোগীভাবে রূপায়িত করেন। তৃতীয়ত, রামমোহনের অবদানের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা আজও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তা বর্তমানকালের গণ্ডী অতিক্রম করে অনাগত ভবিষ্যতেও সজীব এবং সক্রিয় থাকবে।

রামমোহন থেকে যে যুগের সূচনা তার ঐতিহাসিক-সামাজিক পটভূমির কথা বাদ দিয়ে উপরোক্ত ভূমিকার যথার্থ তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। এই যুগটিকে সঠিক ভাবেই ভারতের জাতীয় চেতনাব জাগরণের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু সাধারণত আলোচনা করা হয় সেই যুগচরিত্রের একটি মাত্র দিক নিয়ে অর্থাৎ যে সব কারণ এবং উপাদান জাতীয় চেতনার উন্মেষের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে তারই উপর সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ার নেতিবাচক দিকটি অর্থাৎ জাতীয় চেতনা এবং ঐক্যবোধ জাগ্রত হওয়ার পথে যে অন্তরায়গুলি বিদ্যমান ছিল সেগুলির পর্যালোচনা করার কাজটি সাধারনত উপেক্ষিত হয়। অথচ, ঐ নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অভাবে ইতিবাচক দিকগুলির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করা সম্ভব নয়। বাধাগুলির চরিত্র পযালোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে জাতীয় ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য কি পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং এখনও সেই সংগ্রামের কতখানি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিমাণে রামমোহনেব জীবনের ঐতিহাসিক-সামাজিক পটভূমির উপব আলোকসম্পাত করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণ অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নয়। তবু সেই পটভূমির একটি দিকের প্রতি তিনি সফলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেটি হল দেশের তৎকালীন মানসিক বায়ুমণ্ডলের চরিত্র। যাঁরা সেদিন জাতীয় চেতনার অগ্রদূত এবং ঐক্যমন্ত্রের উদ্‌গাতারূপে বরণীয় হয়েছেন তাঁদের কঠিন সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশ এবং মানসিক বায়ুমণ্ডলের পচনশীল উপাদানগুলির বিরুদ্ধে যেমন তাঁদের বিদ্রোহ করতে হয়েচে তেমনি কঠিন দ্বন্দ্ব চালাতে হয়েছে নিজ অন্তরের সাথে।

আমাদের দেশে জাতীয় চেতনার জাগরণের প্রক্রিয়াটি ছিল দ্বি-মুখী। একদিকে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল মোচনের আকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে সামন্ত-যুগীয় সামাজিক প্রথা, সংস্কার ও ভাবধারার নাগপাশ থেকে মুক্তির প্রচেষ্টা।

সামন্তযুগীয় ভাবধারা জাতীয় চেতনার জাগরণের পথে বিরাট অন্তরায়। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে ভাসাভাসা ভাবে এইটুকু উল্লেখ করেই পর্যালোচকেরা তাঁদের কর্তব্য শেষ করেন। অথচ অন্তরায়ের চরিত্রটিকে বিশদভাবে অধ্যয়নের চেষ্টা না হলে জাতীয় জাগরণের প্রক্রিয়ার সামগ্রিকরূপ সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন রামমোহনের কর্মজীবনের পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তখন তিনি এই দিকটিকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"সুদীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষে ইতিহাস স্তম্ভিত হয়ে আছে। কতকাল এই দেশ নিজে চিন্তা করে নি, চেষ্টা করে নি, সৃষ্টি করে নি, বুদ্ধিপূর্বক অন্তর বাহিরের সম্মার্জন করেনি, তার সক্রিয় সঙ্কল্পশক্তি নব নব ব্যবস্থার দ্বারা নব নব কালের সঙ্গে সন্ধি করে নি। স্বাস্থ্যদৈন্য, অন্নদৈন্য, জ্ঞানদৈন্য, একে একে তার প্রাণের প্রায় সকল শিখাই ম্লান করে এনেছে। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে তার পরাভব বিস্তীর্ণ হয়ে চলল। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আপন ইচ্ছায় অরাজকতা ঘটে এবং বাহিরের ইচ্ছা শূন্য সিংহাসন অধিকার করে বসে, যখন তার নিজের বুদ্ধি অবসর নেয়, বাহিরের বুদ্ধি তাকে চালনা করে—সেই বুদ্ধি তার স্বজাতির অতীত কাল থেকেই তাকে অভিভূত করুক বা অন্যজাতির বর্তমান কাল থেকে এসেই তাকে ঘুড়িয়ে বেড়াক। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আত্মার কর্তৃত্ব আড়ষ্ট হয়, যখন সে কালপরম্পরাগত অভ্যাসযন্ত্রের চাকাগুলোকে অন্ধভাবে ঘুরিয়ে চলে, যখন সে যুক্তিকে স্বীকার করে না, উক্তিকে স্বীকার করে, অন্তরধর্মকে খর্ব করে, বাহ্য কর্মকে প্রবল করে তোলে। কোনো কূট কৌশলের দ্বারা বাহিরের কোনো সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে এই স্থবিরত্বভারমন্থর মানুষের পরিত্রাণ নেই।" (ঐ, ৪০৮-৪০৯ পৃঃ)

এই রকম বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনেই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে দেশ কালের সঙ্গে এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। রামমোহনের সমসাময়িক কালের দেশবাসী তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই দিনের পরিস্থিতির বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,

"তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল—তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র ; এবং সংস্কৃত শিক্ষা

স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরি পরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনও বঙ্গসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই; তখন ছোটো ছোটো গ্রাম সমাজ পল্লীসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়াছিল; ব্যক্তি বিশেষের জাতিকুল, কার্য অকার্য; বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রাম্য-মণ্ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—" (ঐ, ৪১৩ পৃঃ)

সেই গ্রাম্যমণ্ডলীর মানুষের মনের জগৎ ছিল নিতান্ত সংকীর্ণ এবং নিস্তরঙ্গ বদ্ধজলার মত। কবি বলেছেন,

"তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণ-কল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার, ধর্ম তাহাদের লোকাচার প্রচলিত ক্রিয়া কর্ম, মনুষ্যত্ব কেবল অনুগত প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন লাভ।" (ঐ, ৪১৪ পৃঃ)

এমনি অবস্থার ভিতরে বাইরের বিশ্ব থেকে প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ে ভারতীয়, বিশেষত হিন্দুসমাজের উপরে। সেই নিদারুণ আঘাতে যারা জেগে উঠলেন তাঁরা বুঝতে সুরু করলেন যে "কিসেব অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার, এই অপমান, এই জড়তা, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অন্তরের প্রাণ সমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।" (ঐ, ৪৩২ পৃঃ)

ঐ যুগে আবো অনেকে দেশে প্রচলিত অন্ধ সংস্কাব, মূঢ়তা, মানসিক জড়তা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। ইংরাজী শিক্ষিত নব্য বুদ্ধিজীবিরাও ঐ অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। সময়ের দিক থেকে তাঁবা রামমোহনের উত্তরসূরী হলেও ঐ যুগেরই মানুষ। তাঁদের বিদ্রোহের সাথে রামমোহনের বিদ্রোহের মৌল পার্থক্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কবির মতে উক্ত নব্য বুদ্ধিজীবিদের প্রচেষ্টার মূলে গুরুতর দুর্বলতা ছিল। তাঁরা পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারার নিজীকরণের অর্থাৎ-স্বদেশের চিন্তাসম্পদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে তাকে গ্রহণ ও পরিপাকের ব্যাপারে অকৃতকার্য হন। সেই জন্য তাঁদের প্রয়াস প্রধানত নেতিবাচক ও ভাঙনসর্বস্ব হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ঐরূপ কার্যকলাপের সমালোচনা এবং রামমোহনের অনুসৃত পদ্ধতির পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন।

"একবার ভাঙচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি এক প্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণবাবুর 'একাল ও সেকাল' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালী ছাত্রেরা যখন হিন্দুকলেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরও ভীষণতর করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভালো, কিছুই পবিত্র ছিলনা; হিন্দুসমাজের যে সকল কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালোরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিরা বিষন্নমনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈবরের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সর্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন, সেই রামমোহন রায় তাঁহার তো এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি তো স্থিরচিত্তে ভালোমন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আলোক জ্বালাইয়া দিলেন কিন্তু চিতালোক তো জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্ত সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিলেন; যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড় পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভারে, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ডবলে আঘাত করিলেন—তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল।"

('ভারতপথিক রামমোহন রায়, রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৪২৫-৪২৬ পৃঃ)

আপাতদৃষ্টিতে কবির এই বক্তব্যকে হিন্দুয়ানি বলে মনে হতে পারে এবং ধারণা হতে পারে যে তিনি রামমোহনকে দেখেছেন হিন্দুধর্মের সংরক্ষক রূপে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঐক্যের বাণীকে হিন্দুসমাজের মধ্যে সীমিত করে রাখেন নি। হিন্দুয়ানি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব নীচের উদ্ধৃতিটির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

"বর্তমান কালে হিন্দুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমেই ওই অনৈক্যের ধুলা, সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ, সেইটেই সর্বাপেক্ষা লঘু, এবং সেইটেই অল্প ফুৎকারে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু এ ধুলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিশ্বাসবায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারিদিকের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে—সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায়, তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

যখন কোনো প্রবল সংঘর্ষে, কোনো নূতন শিক্ষায় একটা জাতি জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন সে নিজেরই মধ্যে শক্তি সন্ধান করে। সে জানে যে, ধার করিয়া চলে না। যদি পৈতৃকভাণ্ডারে মূলধন থাকে তবেই বৃহৎ বাণিজ্য এবং লক্ষ্মীলাভ নতুবা চিরদিন উঞ্ছবৃত্তি।

আমাদেব সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদিগকে এমন জটিল বিচিত্র ও সুদৃঢ়ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে, যে বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যও নহে ; সেই চির-উদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। আমবা ধূমকেতুর মতো দুই চারিজন মাত্র গর্ববিস্ফারিত পুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকিয়া যাইতে পারি ; কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে তেমন লঘুত্ব সম্ভবপর নহে।

অতএব একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি, উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিস্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।" ('আত্মশক্তি ও সমূহ' শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত 'প্রসঙ্গ কথা নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৮৫৫ পৃঃ)

রামমোহন হিন্দুধর্ম ও সমাজের সংস্কারক রূপে কর্মজীবন শুরু করেন কিন্তু তাঁর কর্ম সেই ক্ষেত্রের সীমাকে অতিক্রম করে বহুদূরে প্রসারিত হয়েছিল। ভারতের জাতীয় ঐক্য এবং আন্তর্জাতিকতার বাণী তিনিই প্রথম এদেশে প্রচার করেন। রামমোহনের সেই বৃহত্তর ভূমিকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেখিয়েছেন যে রামমোহন ইহুদি খৃষ্টান ও মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ থেকে সার সংকলন করে স্বদেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত কবেছিলেন। "এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত।" ('ভারতপথিক রামমোহন রায়, রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৪৩৬ পৃঃ)

রামমোহন পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী ভাবধারার সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন তাই নয়, সেই ভাবধারাকে তিনি আপন করে নিতে পেরেছিলেন। তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছিল বিশ্ব-মানবতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে। রামমোহনের সেই দিকটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে "এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম উপস্থিত হয়েছিল।" (ঐ, ৪২৯ পৃঃ) সেই প্রভাতের বার্তা সম্বন্ধে কবি অন্যত্র লিখেছেন,

"যদিও সেদিন বাহির থেকে পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জ্ঞানের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, তার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে নি। মানুষের সম্বন্ধে বিশ্ববোধ আজও পৃথিবীতে নানা সংকীর্ণ সংস্কারে বাধাগ্রস্ত। আজও পৃথিবী একথা বলতে পাচ্ছে না যে, নূতন যুগ এল। সকল দিকেই এ যে অখণ্ডতার যুগ। এই যুগে জ্ঞানে কর্মে সব মানুষকে মিলিয়ে নেবার রাজপথ উদ্‌ঘাটিত হওয়া চাই। বিজ্ঞানরাজ্যে আজ জ্ঞানে জ্ঞানে অসবর্ণতা দূর করে মিলন আরম্ভ হয়েছে; বিশ্ববাণিজ্যের মধ্যে কর্মের মিলও বিস্তীর্ণ হল, যদিও সেই মিলনপথের বাঁকে বাঁকে আজও বাটপাড়ির ব্যবসা চলে; যতই কঠিন বাধায় কণ্টকাকীর্ণ হোক, তবু বিশ্বরাষ্ট্রনীতির যে সূত্রপাত হয় নি এমন কথা বলা যায় না। এই নূতন যুগধর্মের উদ্‌বোধন বহন করে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের

লাঞ্ছনার মধ্যে যাঁরা এই পৃথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথম বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে দাঁড়াতে পেরেছিলেন—সেই বাণী ভারতের স্বকীয় দৈন্য নিয়ে নয়, দুর্যোগ নিয়ে নয়, সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ নিয়ে। মানবসত্যকে তিনি সমগ্র করে দেখেছিলেন।" (ঐ, ৪১০ পৃঃ)

'রামমোহন প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে কবি লিখেছেন,

"তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন—আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন—আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ জীবনগ্রহণ ও জীবনদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীর যে দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীররুদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন।" (রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৪২৯ পৃঃ)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন তথা আন্তর্জাতিকতা সম্বন্ধে কবির নিজের দৃষ্টিভঙ্গী উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়েছে।

বিদেশের প্রগতিশীল ভাবধারার সম্পদ গ্রহণ করা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন সংকীর্ণতা ছিলনা। তেমনি বিদেশের অন্ধ অনুকরণ বা তার সামনে ভিক্ষাবৃত্তিকেও তিনি সমর্থন করেন নি। কোন বড় জিনিষকে ভিক্ষা করে পাওয়া যায় না,

অন্যের কাছে থেকে যা নেওয়ার তাকে দীনতা স্বীকারের দ্বারা লাভ করা যায় না। রামমোহনের জীবন ও কর্মে এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেন রবীন্দ্রনাথ এবং সেই শিক্ষার আলোকে নিজের যাত্রাপথকে উদ্‌ভাসিত করে তোলেন।

"একদিন যে সময়ে য়ুরোপের জ্ঞানের ঐশ্বর্য হঠাৎ আমাদের চোখের সমুখে খুলিয়া গিয়া আমাদের দেশের নূতন ইংরেজি শিক্ষিত লোকদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল সেই সময়ে রামমোহন রায় আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন! তখনকার নিতান্ত শিশু ও দুর্বল বাংলাগদ্যেও তিনি উপনিষৎ বেদান্ত প্রভৃতি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সেই ঘোরতর ইংরেজি বিদ্যাভিমানের দিনে জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের লজ্জা দূর করিয়া দিবার জন্য প্রথম দাঁড়াইয়াছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন হইতে সেই অগৌরব অল্পমাত্রও দূর না হইয়াছিল ততক্ষণ আমরা নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষুকের অবস্থায় আমাদের ইংবেজি মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইরাছিলাম।

* * *

রামমোহন রায় যে পশ্চিমেব ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।" (ঐ, ৪২৮-৪২৯ পৃঃ)

রামমোহনের জীবন থেকে যে শিক্ষা নিয়েছেন কবি, তাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সেই ঐক্যবোধ, সেই উদার মানবতাবাদী দৃষ্টিকে প্রয়োগ করেছেন জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে। স্বদেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সমস্যা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,

"আমরা যখন আজ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য বদ্ধপরিকর তখন আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্যক যে, অন্তরের ঐক্য হারিয়ে শুধু বাহ্যবিধির

ঐক্যদ্বারা কোনো দেশ কখনোই সার্বজনীন একত্ববোধে মহাজাতীয় সার্থকতা পায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বহু উপরাষ্ট্রের সমবায়ে একটি প্রকাণ্ড রাষ্ট্র—যেন একটা বৃহৎ রেলোয়ে ট্রেন, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে চলেছে সুনির্দ্দিষ্ট পথে। সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ সেখানে সকলে শিক্ষায় নিবিড়ভাবে মিলে একজাতি হয়ে উঠেছে, মোটের উপরে ভাবনা ও বেদনার এক স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা সেখানে জনচিত্তকলেবর অধিকৃত। তারা পরস্পর পরস্পরের একপথে চলবার বাধা নয়, পরস্পরের সহায় তারা। তাদের শক্তি সাফল্যের এই প্রধান কারণ।

খণ্ডিত মন ও আচরণ নিয়ে ইতিহাসের গোড়া থেকে আমরা বরাবর হারতে হারতে এসেছি। আর, আজই কি আমরা সকল খণ্ডতা সত্ত্বেও জিতে যাব এমন দুরাশা করতে পারি? বিদেশীর অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐক্যের দরকার আছে, একথা আমরা তর্কদ্বারা বুঝি, কিন্তু কোনোমতেই সেই অন্তর দিয়ে বুঝিনে, যেখানে বিচ্ছেদের বিষ জড়িয়ে আছে। বেহারের লোক, মাড়োয়ারের লোককে আমরা পর বলেই জানি, তার প্রধান কারণ যে আচারের দ্বারা আমাদের চিত্ত বিভক্ত সে আচার কেবল যে অস্বীকার করে না বুদ্ধিকে তা নয়, বুদ্ধির বিরুদ্ধে যায়। আমাদের ভেদের রেখা রক্তের লেখা দিয়ে লিখিত। মূঢ়তার গণ্ডির মতো দুলঙ্ঘ্য ব্যবধান আর কিছুই নেই।" (ঐ, ৩৯৫-৩৯৬ পৃঃ)

জাতীয়তাকে কবি দেখেছেন জাতীয় সীমাব মধ্যে মানবঐক্যের পরিপূর্ণ প্রকাশরূপে। সেই জিনিষ বিশ্বমানবঐক্যের সোপান রূপে কাজ করবে। কিন্তু সেই জাতীয়তা যখন মানবঐক্যের বিরোধী শক্তিরূপে দেখা দিয়েছে তখন কবি তাকে কঠিন আক্রমণ করতে দ্বিধা করেন নি। "আপনাকে ও জগৎকে সত্য করে জানবার ও দেখবার জন্যেই মানুষ এই জগতে এসেছে। মানুষও যে-সমস্ত অনুষ্ঠান রচনা করেছে—তার বিদ্যালয়, তার রাজ্যসাম্রাজ্য, নীতিধর্ম সমস্তেরই মূল কথা এই যে, মানুষ যে যথার্থ কী সেটা মানুষকে প্রকাশ করতে হচ্ছে। মানুষের অনুষ্ঠানে মানুষই বিরাটরূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। সেইজন্য সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতরকার আদর্শ হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। মানুষ নিজেকে যে ছোটো বলে জানছে, মানুষের ধর্ম কর্ম তারই প্রতিবাদ করে তাকে বলছে, 'তুমি ছোটো নও, তুমি আপনার মধ্যে আপনি বদ্ধ নও, তুমি সমস্ত জগতের— তুমি বড়ো, বড়ো, বড়ো।

কিন্তু মানুষের এই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে. সে প্রবেশ করছে। মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগ-যুক্ত করবে, সকলকে এক করবে—এই তো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু, সেই ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে; কত অন্যায় কত অসত্য, কত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে। মানুষের 'জাতীয়তা' ইংরাজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎরূপকে ব্যক্ত করবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু, সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্য শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ, কত আঘাত, কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। মানুষের তপস্যা একদিকে, অন্যদিকে তপস্যা ভঙ্গ করবার আয়োজন—এ দুইই পাশাপাশি রয়েছে।" (সৃষ্টির ক্রিয়া নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৫০১ পৃঃ)

ইউরোপে যখন প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা চলেছে সেই সময়ে সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল কবির কণ্ঠে।

"ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন.; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে—তা হবে না, ইতিহাস বিধাতার এই আদেশ। মানুষ আজ তাই সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এতদিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ সৃষ্টি করেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে। ইতিহাসবিধাতা বলেছেন, "এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধূলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না।" ('আরো নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৫০৫ পৃঃ)

ঐ সময়েই তিনি 'মা মা হিংসীঃ' নামক প্রবন্ধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় উভয়ক্ষেত্রে মানুষের পুঞ্জীভূত পাপের বিরুদ্ধে লেখেন,

"সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে—কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেকদিন ধরে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ

করবেই করবে। এক এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশী শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শাণ দিয়েছে। পীস্ কনফারেন্স—শান্তি স্থাপনের উদ্‌যোগ চলছে, সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্‌ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে? এযে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকারধারণ করেছে—সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতে হবে: মা মা হিংসীঃ।" (ঐ, ৪৯৬ পৃঃ)

উপনিষদীয় ঐক্যতত্ত্ব কবিগুরুর চেতনায় এই মহান্ মানবতাবাদী পরিণতি লাভ করেছে। আমাদের জাতীয় জাগবণের প্রথম প্রভাতে তিনি ভারতের সেই মহৎ সাধনার উত্তবাধিকারকেই দেশবাসীর সামনে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই বিখ্যাত কবিতাটিব মাধ্যমে

"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে
এই ভারতেব মহামানবের সাগরতীরে। ...
হেথা একদিন বিরামহীন মহা-ওংকার ধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যা বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আবাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

রবীন্দ্রমানসের বিকাশের ধারা

রবীন্দ্রমানসের বিকাশের ধারা এগিয়ে চলেছে দুইটি পরস্পর বিরোধী প্রবনতার মধ্যে সংঘাতের ভিতর দিয়ে। অদ্বৈতঅনুভূতির সাধনায় আছে আধ্যাত্মিক প্রমত্ততার এবং প্রেমের সাধনায় আছে রসের বিকারের আশঙ্কা। সেই আশঙ্কার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের আগুনে পুড়েই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবোধ মানবপ্রেমরূপে নিকষিত হেমে পরিণত হয়েছে। কবি-মানসের বিকাশের প্রক্রিয়াকে ধারাবাহিক ভাবে অধ্যয়ন করলে এই বক্তব্যের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুখের বিষয়, কবি নিজেই তাঁর মননের এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়ে এসেছেন তার কথা উপনিষদীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যার দ্বারাই ফুটিয়ে তুলেছেন 'আত্ম-পরিচয়' নামক বইটিতে।

"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। ইহুদী পুরাণে আছে— মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোকে। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে, না জয় করতে পেরেছি সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়— তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়েব গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়, তাঁর বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির' পরে
যখন পড়ে,
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি

তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদন খানি।

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ জীবনমৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গলোক থেকে মানুষকে লজ্জা-দুঃখ-বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে তার থেকে তাব আর বিচ্যুতি নেই। তাই উপনিষদে আছে সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলের সঙ্গেই এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে—অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্তরূপের ক্ষেত্রে তাকে আবার মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তম্, মানুষ তখন আপন প্রকৃতিব অধীন—তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তাবপরে মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডবায় না। সেই অবস্থায় শিবম্, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়,—শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখেব, ভোগ ও ত্যাগের, জীবন ও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতম্, সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া, তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই যে যাত্রা এব প্রথমে জীবন, তারপরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুয সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেন না জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুবধার নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্ত্যালোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃত লোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে এই অদ্বৈতে অমৃতে আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি তারা

পারে যাবে কী করে। সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং 'গময়', গময় এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, এড়িয়ে যাবার জো নেই।" (রচনাবলী, দশমখণ্ড, ২০৩-২০৪ পৃঃ)

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যাকে ধর্ম বলেছেন তা প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয়, তা হল তাঁর রূপায়মান জীবনবেদ।

"আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি এমন কথা বলতে পারি নে—অনুশাসন-আকারে তত্ত্ব-আকারে কোনো পুঁথিতে লেখা ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, উদ্‌ঘাটিত করে, স্থির করে, দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরসভোগ যে সেই ধর্মের প্রধানলক্ষ্য বা উপাদান নয়, এ কথা নিশ্চয় জানি। আমি স্বীকার করি, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে-বর্জন-করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈতরূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।"

(ঐ, ২০৩ পৃঃ)

এই ধর্মবোধের বিকাশের ইতিহাসই কবিমানসের বিকাশের ইতিহাস। তাঁর মন কি ভাবে শান্তম্ থেকে শিবমের দিকে, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানুষের সুখদুঃখের জগতের দিকে এসেছে সে কথা বর্ণণা করেছেন 'আত্ম-পরিচয়' এরই পৃষ্ঠায়। যখন কবির বয়স অল্প ছিল তখন লোকালয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, একান্ত যোগ ছিল বিশ্বপ্রকৃতির সাথে। সে যোগ শান্তিময়, তার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই, মনের সঙ্গে মনের সংঘাত নেই। শিশুকালের পক্ষে এই অবস্থাই প্রয়োজন। কেন না তখন চাই

অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্য। বীজ যেমন ভাবে মাটির বুকের মধ্যে পর্দার আড়ালে থেকে শান্তিতে রস শোষণ করে তেমনি। ঝড়বৃষ্টি রৌদ্রছায়ার ঘাতপ্রতিঘাত থেকে নিরাপদে বৃহতের আস্বাদনে সে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ধর্মবোধের আভাষ পায়। কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের চিত্তের মিল সহজ হলেও তাতে মানুষের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা ঘটতে পাবে না। চিত্ত চায় বড মিল এবং তা পাওয়া সম্ভব বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে। এই উপলব্ধির অঙ্কুর যে কবির মনে প্রথম বয়সেই জন্ম নিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় 'প্রকৃতির পরিশোধ' নামক নাট্যকাব্যে। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র এক সন্ন্যাসী। সে সংসারেব সমস্ত স্নেহভালবাসা মায়ামমতাকে বন্ধন বলে গণ্য কবে এবং সেই জাল ছিঁডে ফেলে অনন্তের বিশুদ্ধ উপলব্ধির সন্ধানে পথে বার হয়। সে চেয়েছিল প্রকৃতির উপরে জয়ী হতে। কিন্তু অবশেযে ছোট একটি বালিকাব প্রতি স্নেহ তাকে আবার সংসারে ফিরিয়ে আনে। ফিবে আসার পব সন্ন্যাসী উপলব্ধি কবে যে "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।"
(জীবন স্মৃতি, রচনাবলী, দশমখণ্ড, ১০৯ পৃঃ)

'প্রকৃতিব প্রতিশোধ' নাটকের মর্মবাণী কবি নিজে নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা কবেছেন,

"প্রকৃতির প্রতিশোধের একদিকে যত সব পথের লোক, যত সব গ্রামেব নরনাবী—তাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে অচেতনভাবে দিন কাটাইয়া দিতেছে; আব একদিকে সন্ন্যাসী, সে আপনার ঘর-গডা এক অসীমেব মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমেব সেতুতে যখন এই দুই—পক্ষেব ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমার অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির

প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটি ভূমিকা। আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" (ঐ, ১০৯-১১০ পৃঃ)

মানবপ্রেমের মধ্যেই দ্বন্দ্বের সমাধান-এই মূলসুরটি এখানে দেখা দিয়েছে। সেই মূলসুরের ক্রমপরিণতির গোড়ার দিকের পর্যায়গুলি জীবনস্মৃতিতেই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

"সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহা-সমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে-উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষদৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিঃশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়, সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দেওয়া এবং নেওয়া। সেই সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ঝরধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে, হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্য সভায় প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের এই আত্মনিবেদন।"

(জীবনস্মৃতি, রচনাবলী, দশমখণ্ড, ১২১-১২২ পৃঃ)

'কড়ি ও কোমল'এ কবি তাঁর যাত্রাব এক অধ্যায় শেষ করে এগিয়ে চলেছেন যে অধ্যায়ে সেখান থেকে মানুষের সুখদুঃখ, ভালমন্দ প্রভৃতির সংঘাত ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর সে পন্থা। সে সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতির উপসংহারে কবি বলেছেন, "এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙাব পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালোমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুবতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন।" (ঐ, ১২৪ পৃঃ)

কবি যাকে বলেছেন মানুষের জীবননিকেতনে আসন লাভের দরবার, এবং বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের আত্মনিবেদন, সেই জিনিসটি কোন পূর্বকল্পিত এবং সুনির্দ্দিষ্ট ছকে বাঁধা সচেতন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় নি। জীবনের যাত্রাপথে প্রতি পদক্ষেপের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি কতকটা যেন কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁকে পরিচালিত করেছে। তিনি কখনও অন্তরের অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। আবার কখনও বাইবেব আলোক তাঁকে সেখান থেকে টেনে বার করে নিয়ে এসেছে। সেই আলোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি জাগ্রত হয়ে অন্তরে আনন্দলোকের সৃষ্টি করেছে। এমনিভাবেই কবির জীবনবেদ একটি সমগ্ররূপ লাভের দিকে এগিয়ে চলেছে। গোড়ার দিকে সেই প্রক্রিয়াটি কবির কাছে খুব পরিস্কাব ছিল না। তাই তিনি তার পিছনে অনুভব করেছেন এক অন্তর্লোকবাসী রহস্যময় সত্তার প্রভাব।

"বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব করিতে দেয় না। তাহাকে একথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্যাপ্ত।

* * *

কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোনো বিশেষভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষমাত্র—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আব-একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান। ফুৎকার বাঁশির এক একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্তৃত্ব উচ্চস্বরে প্রচাব করিতেছে, কিন্তু কে · সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিনীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে কিন্তু ফুঁ তো বাঁশি বাজাইতেছে না। সেই বাঁশি যে বাজাইতেছে তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিনী বর্তমান আছে, তাহার অগোচব কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপন কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত,
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নবীন কৌশলে
গড়িলে মনের মতো।"

(আত্মপরিচয়, রচনাবলী, দশমখণ্ড, ১৬৭-১৬৮ পৃঃ)

শুধু কবিতা লেখার ব্যাপারেই নয়, জীবনের সমস্ত কাজে কবি তখন সেই অদৃশ্য রচয়িতার প্রভাব দেখেছেন।

"শুধু কি কবিতা লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কিনা জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারে বারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন— তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা, বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই—সে আপনার ঘরের সুখসম্পদের জন্যই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই ঘোরো সুখদুঃখের দিক হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড় পর্বত অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।" (ঐ, ১৬৯ পৃঃ)

এই রহস্যময়কে উদ্দেশ্য করেই কবি লিখেছেন,

"একী কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
যে দিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?

* * *

একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
যে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতি।
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,

ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহবরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগলবেশে।"

এখনও কবির কাছে পথ পরিষ্কার নয়, এবং লক্ষ্যও নয় স্পষ্ট। তিনি প্রধানত অনুভূতির প্রেরণায়ই অচেনা পথ অতিবাহন করে চলেছেন। তবু লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, রহস্যময়ের সন্ধানে কবি বাহির ছেড়ে নিজ অন্তরে সমাহিত হওয়ার চেষ্টা করেন নি। তিনি বারবার সীমাকে অতিক্রম করে চলেছেন। নিজেরই অজানিতে তাঁর নিজের বাঁশির সুরে বেজে উঠেছে সেই এগিয়ে চলার আহ্বান। তিনি বলেছেন যে সোজা সাদা কথায় যা বলতে চেয়েছেন তার মধ্যে এমন একটা সুর এসে পড়েছে যাতে বলার কথাটি ব্যক্তিগত না হয়ে বিশ্বের হয়ে উঠেছে। নিজের পটে তিনি ছবি আঁকেন। কিন্তু তাতে যে রঙ প্রতিফলিত হয় সে রঙের তুলি তাঁর হাতে ছিল না। এই ভাবটিকেই তিনি ছন্দে প্রকাশ করে বলেছেন,

"নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে উঠে তায়
নূতন রাগিনীভরে।
যে কথা ভাবিনি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি নি জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে।" (ঐ, ১৬৯ পৃঃ)

কবি নিজের প্রতি কাজে, প্রতি কথায়, গানে ও সুরে যার অদৃশ্য হস্তের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করেছেন তাকেই 'জীবনদেবতা' বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা কে তাই নিয়ে অনেক পণ্ডিত অনেক ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু কবির নিজের ব্যাখ্যা অনুধাবন করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই— দেবতা কোন কল্পলোকবাসী রহস্যময় সত্তা নয়। তা হল আসলে কবির

বিকাশমান জীবনবেদ এবং তার মূলে রয়েছে বিশ্বপ্রবাহের সাথে ঐক্যের অনুভূতি।

"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎস্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এতোবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।" (ঐ, ১৬৯-১৭০ পৃঃ)

সেই জীবনবেদ যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অঙ্কুর যতই মহীরুহে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে ততই রহস্যের আবরণ এসেছে ক্ষীণ হয়ে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে কবি এবং তত্ত্বপ্রচারকের মধ্যে প্রভেদ আছে। তত্ত্বপ্রচারক একটা সুনির্দ্দিষ্ট মতকে যুক্তিতর্ক ও তথ্যের সাহায্যে সুপরিকল্পিত ভাবে উপস্থাপিত করেন। সেই কাজে যে পরিমাণে অসম্পূর্ণতা থাকবে সেই পরিমাণে তত্ত্বপ্রচারক হিসাবে তাঁর দুর্বলতা। কিন্তু কবির সৃষ্টি উৎসারিত হবে প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যের মত স্বতস্ফূর্ত ধারায়। তত্ত্ব বা সত্যকে প্রতিপন্ন করা কবির কাজ নয়, তাঁর কাজ হল সত্যকে সৃষ্টিমূলক ভাবে জেনে রসসম্মত রূপে উপস্থিত করা। অর্থাৎ, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর মনে সত্যের যে প্রতিফলন হবে, তা অনুভূতির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে কবিসত্তার এক অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হবে। সেই অনুভূতি হৃদয় তন্ত্রীতে যে সুরলহরীর জন্ম দেবে তারই সহজ স্বতোৎসারিত অভিব্যক্তি অন্যের অন্তরের অন্তঃস্তম স্থানে সাড়া জাগাবে। এই হল কবির সাফল্যের মাপকাঠি। এই রহস্যে কোন দুর্জ্ঞেয় প্রহেলিকার অস্তিত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই কবির এই ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন।

"বিশ্বশক্তি যদি আমার কল্পনায় আমার জীবনে এমন বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকেন যাহা অন্যের পক্ষে দুর্বোধ্য তবে আমার কাব্য আমার জীবন পৃথিবীর

কাহারও কোনো কাজে লাগিবে না—সে আমারই ক্ষতি, আমারই ব্যর্থতা। সেজন্য আমাকে গালি দিয়া কোনো লাভ নাই, আমার পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব, আমার অন্য কোনো গতি ছিল না।

বিশ্বজগৎ যখন মানবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া মানবভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে তখন তাহা কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি-প্রতিচ্ছায়ার মতো দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি তাহা জগৎপরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে কালে নবতররূপে গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ গীতিকাব্য-রচয়িতার কোন্ কবিতা ভালো, কোন্‌টা মাঝারি তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবাব যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপানি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশ শক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিতেছেন তাহাই দেখিবাব বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বাবংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবিব কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে—যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত কবিয়া থাকে—যাহা অশরীব ভাবরূপে নিবাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া থাকে—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির জীবনী। সেই জীবনীব বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্য-রচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।" (আত্ম-পরিচয়, রচনাবলী, দশমখণ্ড, ১৮০ পৃঃ)

'আত্ম-পরিচয়' এর পৃষ্ঠাতেই পরমুহূর্তে কবি 'জীবনদেবতা' সম্বন্ধে লিখেছেন,

"এই পত্রে আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি, যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমাব রূপরূপান্তর জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই 'জীবনদেবতা' নাম দিয়া

লিখিয়াছিলাম—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিষ্ঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা-সম।" (ঐ, ১৭২-১৭৩ পৃঃ)

কবির জীবনদেবতা যে এই পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থিত এবং মানুষের ধরাছোঁয়ার অতীত কোন সত্তা নয়, সে কথা তিনি উপরের ছত্রগুলিতে সংশয়াতীত ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। ঐক্যের শক্তিকেই তিনি ভালবেসেছেন এবং বলেছেন

"আপনি বরিয়া লয়েছিলে মোরে
না জানি কিসের আশে।
লেগেছে কি ভালো, হে জীবন নাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত
আমার নর্ম আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে ?"

নিজের জীবনের মধ্যে যে আবির্ভাবকে তিনি অনুভব করেছেন, যা তাঁকে 'কাল-মহানদীর নূতন নূতন ঘাটে' বহন করে নিয়ে চলেছে, সেই তাঁর জীবনদেবতা।

ঐক্যবোধ একদিক বিশ্বপ্রকৃতির এবং আর একদিকে মানুষের জগতের সাথে। প্রকৃতির সাথে ঐক্যবোধের স্বরূপটিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন নিম্নরূপ ভাবে।

"এই জীবন যাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষদৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপ্ত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে। তখনি একথা বলিতে পারিয়াছি—

হই যদি মাটি, হই যদি জল
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা;
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।

তখনি এ কথা বলিয়াছি—

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ি,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনাকে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।

এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই—

তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিলায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছি প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্যরজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে, তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধরেণু।

আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।" (ঐ, ১৭৫-১৭৬ পৃঃ)

কবিতায় যে ভাব ব্যক্ত হয়েছে তাকে বিশদভাবে বোঝাবার জন্য কবি তাঁর তিনটি পুরাতন চিঠি থেকে তিনটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন। সেই চিঠিগুলির পর্যালোচনার দ্বারা বোঝা যায় যে প্রকৃতির সাথে কবির ঐক্যবোধে কোনরূপ রহস্যবাদ আরোপের কারণ নেই।

"এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—

এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছিনে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে ? কতবড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এতবড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না। জগতথেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না; মনটা যেন আরো শতলক্ষ যোজন দূরে!

* * *

এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর দেশ দেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎ সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে-একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য-সনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।

এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন।......আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পুর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্রভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে।

তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলাম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যামচ্ছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীতহিরণ্যঅঞ্চল পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন—আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোণার প্রতি তেমন দৃকপাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন—আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।"

(ঐ, ১৭৬ ১৭৭ পৃঃ)

'বসুন্ধরা' কবিতাটিতে কেউ কেউ রহস্যবাদ এবং জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবি দেখে থাকেন। কিন্তু সে ভ্রান্ত ধারণার নিরাকরণ কবি নিজেই করেছেন। কবিতাটিতে যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে তা হল আসলে পৃথিবী এবং মানুষের বিকাশ ও উভয়ের মধ্যকার নিবিড় যোগসূত্রটির কাব্যময় উপলব্ধি।

প্রকৃতির সাথে ঐক্যবোধ কি ভাবে কবিকে মানবঐক্যবোধের পথে পরিচালিত করেছে তার পরিচয় পাওয়া উপরিল্লিখিত পত্রগুলির তৃতীয় পত্রটিতে।

"প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণপাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ-বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন, কেহ-বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে বুঝিবা সে এক জায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই

চলিতে হইতেছে—সকলই এই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার দিক হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই; যে জিনিসটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিসটাকে প্রকাশ করে তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে—প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।" (ঐ, ১৭৭-১৭৮ পৃঃ)

কবি বিশ্বের ঐক্যতত্ত্বকেই দেখেছেন চিন্ময়সত্তা রূপে। সেই,উপলব্ধি তাঁকে জীবনদেবতার স্তবগানে উদ্‌বুদ্ধ করেছে, বিশ্বএকাত্মবোধ উৎসারিত হয়েছে গানে।

"আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।"

সেই বিস্ময়কে এবং আনন্দকেই প্রকাশ করেছেন 'আত্ম-পরিচয়' এর পৃষ্ঠায়।

"আমি, কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জল-স্থল তরুলতা পশুপক্ষী চন্দ্র-সূর্য দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নি-বায়ু সূর্য-চন্দ্র মেঘবিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা

দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তব সংগীত ঝংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে।" (রচনাবলী, দশম খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ)

এই বিকাশমান জীবনবেদেরই আর একটি অনবদ্য অভিব্যক্তি হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

নিজের মননের বিকাশ সম্বন্ধে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে কবি 'আত্ম-পরিচয়ে' উক্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে জিনিষকে ধর্মবোধ বলেছেন তার বিকাশের প্রক্রিয়া অধ্যয়নের কাজটি বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। কবির সেই ধর্মবোধ "উপচেতন-লোকের অন্ধকারের" ভিতর থেকে ধীরে ধীরে "চেতন-লোকের আলোতে" উঠে এসেছে। তার পথ কবির নিজেরকাছে প্রথম থেকে সুস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াটিকে সমগ্রভাবে অধ্যয়ন করলে পরিষ্কার বোঝা যায় কোন্ প্রবণতা তার মধ্যে গোড়া থেকেই বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ১৮৯৫ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি নিজ হৃদয়ে ধর্মবোধের উন্মেষ সম্বন্ধে

বিস্তৃত আলোচনা করেন। চিঠিটি 'ছিন্নপত্রাবলী' নামক সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত।

"ঠিক যাকে সাধারণত ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব। আমার সুখদুঃখ, অন্তর বাহির, বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখা তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে; কিন্তু সে সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নেই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ করে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য। জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে—প্রত্যেক কথাটি বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না; কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি, বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে, আমার সুখ-দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে। এই থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটা ধূলিকণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি এইটেকেই একটা বিরাট বৃহৎ ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অনুপরামাণুও থাকতে পারে না; আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুস্নিগ্ধ সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়, সেই জন্যে এই জ্যোতির্ময় শূন্য আমার

অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতেম? আমার সঙ্গে অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্রভাষা হচ্ছে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে, কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।" (রচনাবলী, একাদশখণ্ড, ২৪৯ পৃঃ)

ছিন্নপত্রাবলীতে দেখা যায় যে আর একটি চিঠির উপসংহারে কবি লিখেছেন।

"উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত করে, স্বেচ্ছাবচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাইনে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে করে, বিশ্বাস করে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষেব মতো মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবাব চেষ্টা কবা আমাব কাজ নয়।" (রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ)

উক্ত চিঠিটি লেখা ইং ১৮৯১ সালে। তার কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হয় 'মালিনী' নাটক। তার ভূমিকায় কবি লেখেন "আসল কথা, মনের একটা সত্যকার বিস্ময়ের আলোড়ন ওর মধ্যে দেখা দিয়েছে।

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশংকরের উতুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষাবপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ হয়ে ছিলনা, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব নয় সে, মূর্তিশালার মাটিতে পাথবে নানা অদ্ভুত আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসে নি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করে নি। সত্য যার স্বভাবে, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা, তার অন্তঃকরণ থেকে এই পরিপূর্ণ মানব-দেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক সকল পৌরাণিক ধর্ম-জটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।"

শেষ বয়সে 'মালিনী' নাটকের সম্বন্ধে কবি লেখেন, "পরিণত বয়সে যখন 'মালিনী' নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনও এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দ্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি—

বুঝিলাম ধর্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন ; দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ ;
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্বত্যাগ। ধর্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল, নিখিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তরমোর আনন্দবেদনে।"

(রচনাবলী, দশমখণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)

কবি তাঁর ধর্মবোধের চরিত্র বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে গিয়েছেন 'আত্ম-পরিচয়' এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। সাধারণভাবে যেমন বলেছেন যে মানুষের ধর্মটিই হল তার অন্তরতম সত্য, তেমনি তাঁর একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য-গুলির কথাও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছেন।

"এখন কথা হচ্ছে এই যে, আমি কোন্ ধর্মকে স্বীকার করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমি যখন 'আমার ধর্ম' কথাটা ব্যবহার করি তখন তার মানে এ নয় যে আমি কোনো একটা বিশেষ ধর্মে সিদ্ধিলাভ করেছি। যে বলে আমি খৃস্টান সে যে খৃস্টের অনুরূপ হতে পেরেছে তা নয়—তার ব্যবহারে প্রত্যহ খৃস্টানধর্মের বিরুদ্ধতা বিস্তর দেখা যায়। আমার কর্ম, আমার বাক্য কথনো আমার ধর্মের বিরুদ্ধে যে চলে না এতবড়ো মিথ্যা কথা বলতে আমি চাইনে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমার ধর্মের আদর্শটি কী।

বাইরে আমার রচনার মধ্যে এর উত্তর নানা জায়গাতেই আছে। অন্তরেও যখন নিজেকে এই প্রশ্ন করি তখন আমার অন্তরাত্মা বলে—আমি তো কিছুই ছাড়বার পক্ষপাতী নই, কেননা সমস্তকে নিয়েই আমি

সম্পূর্ণ।

আমি যে সব নিতে চাই রে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে মেলে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত। অতএব, সামঞ্জস্য সত্যের ধর্ম বলে বাদসাদ দিয়ে গোঁজামিলন দিয়ে একটা ঘর-গড়া সামঞ্জস্য গড়ে তুললে সেটা সত্যকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে।

* * *

তাই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে পৃথিবীটি বস্তুত যেমন, অর্থাৎ নানা অসমান অংশে বিভক্ত, তাকে তেমনি করেই জানবার সাহস থাকা চাই। ছাঁট দেওয়া সত্য এবং ঘর গড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশি, তাই আমি অসামঞ্জস্যকেও ভয় করিনে।" (রচনাবলী, দশমখণ্ড, ১৮৮-১৮৯ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ যে তাঁকে সম্পূর্ণসত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস যোগায় শুধু তাই নয়। তাঁকে সত্যের জন্য অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। ধর্ম জিনিষটাকে তিনি সংসারের রণেভঙ্গ দিয়ে পালাবার ভদ্রপথ হিসাবে দেখেন নি। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর সংগ্রামী ধর্মবোধ কি ভাবে বাধার সঙ্গে লড়াই করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে তার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন 'আত্ম-পরিচয়' এর পরবর্তী ছত্রগুলিতে।

মানুষ যদি বৃহৎকে, সত্যকে অস্বীকার করে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকে তাতে তার মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়। তখন ক্ষতি তাকে বিমর্ষ করে তোলে, বর্তমান তার ভবিষ্যতকে হনন করে এবং দুঃখশোক এত বড় হয়ে ওঠে যে তাকে অতিক্রম করে সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। তখন মানুষ চায় প্রাণপণে শুধু সঞ্চয় করতে, ত্যাগ করবার কোন অর্থ খুঁজে পায় না, ছোটখাটো ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জরিত হয়ে ওঠে। সেই মানসিক এবং আত্মিক অবক্ষয়ের সম্বন্ধেই কবি লিখেছেন—

"শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী।"

সেই অবস্থাকে অতিক্রম করে গভীর উর্ধে ওঠার সঙ্কল্প জাগে। 'ছোটো আমি' চায় 'বড়ো-আমি'র সাথে মিলতে।

"এই বড়ো-আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগল অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে তারই উপক্রম দেখি, 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্যে—

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে সেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহাআনন্দ,
নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাবে নবীন বাসনা।"

(ঐ, ১৯০ পৃঃ)

'বড়ো আমি'র সাথে মিলনের সাধনা অগ্রসর হয়েছে বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। 'সোনার তরী'তে সে যাত্রার সূত্রপাত মাত্র। যাঁরা ঐ কবিতা-গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথের রহস্যবাদের মুখ্য নিদর্শন মনে করেন তাঁদের ভ্রান্তধারণার নিরসন কবি নিজেই করেছেন। 'বিশ্বনৃত্য' কবিতাটি প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

"কিন্তু এতেও বাজানার সুর। যদিও এসুর মন্দ্র বটে, কিন্তু মধুর-মন্দ্র। যাই হোক্ কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠছে বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করছে। তাই ওই কবিতাতেই আছে—

ওই কে বাজায় দিবস নিশায়
বসি অন্তর-আসনে
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর—
কেহ শোনে, কেহ না শোনে।

অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই
মহান মানবমানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুরুষ সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুর পথ দিয়ে চালনা করছেন এখানে তাঁরই কথা দেখি। এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ।" (ঐ, ১৯০ পৃঃ)

শান্তির পালা শেষ, শিবকে জানার পালা সুরু, সে জানার বেদনা বড় তীব্র। মঙ্গলের মধ্যে মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে, সুখদুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যখন ছিল তখন সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যখন বাধল তখন তাকে এড়িয়ে সত্যকে জানা হয় না। কবি বলেছেন।

"এইখানে 'মহদভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'। কিন্তু এই বড়ো বেদনার মধ্যেই আমাদেব ধর্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎশক্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে 'নৈবেদ্যে'র দুটি কবিতায় একথা বলা আছে।

১

মাতৃস্নেহবিগলিত স্তন্যক্ষীররস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস—
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাবরসরাশি
কৈশোরে করেছি পান, বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে—প্রকৃতির বুকে
লালনললিত চিত্ত শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে, প্রভাত-শর্বরী-সন্ধ্যা-বধূ
নানাপাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়ে থাকে দূরে—
কোনো দুঃখ নাহি। পল্লী হতে রাজপুরে

এবার এনেছ মোরে, দাও চিত্তে বল।
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্মল।

২

আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠী অলংকার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আব নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।" (ঐ, ১৯১ পৃঃ,)

কবি প্রিয়কে পেতে চেয়েছেন শ্রেয়কে আশ্রয় করে, সেই শ্রেয় যা মানুষের আত্মাকে দুঃখের পথে সংঘাতের আবর্তের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাঁর সেই চাওয়া বাঁশির মোহিনী সুরে মুগ্ধ হয়ে নিজের লক্ষ্য ভুলে বসে থাকার জিনিষ নয়। সেই কথাটিই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'চিত্রা'র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটিতে। "বাঁশির সুরের প্রতি ধিককার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ।

"যেদিন জগতে চলে আসি
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসারসীমা।

মাধুর্যের যে শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এ কবিতায় যার অভিসার সে কে?

কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তরপানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহবানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে।
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোমহুতাশন—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।" (ঐ, ১৯১-১৯২ পৃঃ)

কার অভিসার? কে সে অচেনা অজানা? এই প্রশ্ন নিয়ে কবিতাটির অনেক রকম ব্যাখ্যাই হয়েছে। রহস্যবাদী এবং রোম্যান্টিক দুই ধরণের ব্যাখ্যাই আছে। এখানে কবি যে মৃত্যুহীন দুঃসাহসিক অভিযানেব কথা বলেছেন তাতে রোম্যান্টিকতা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সে রোম্যান্টিকতার প্রেরণা এসেছে 'ছোট-আমি'র গণ্ডী ছেড়ে 'বড়ো-আমি'র দিকে যাত্রার প্রবণতা থেকে। ঐ কবিতাতেই আগের অংশে কবি বলেছেন,

"মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তারি কাছে জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।"

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে কি ভাবের উদয় হয়েছিল তার ব্যাখ্যা করেছেন বলা যায় 'মানুষের ধর্ম' বইটিতে। সেখানে

তিনি বলেছেন,

"তাই বিরাটকে বলি রুদ্র, তিনি মুক্তির দিকে আকর্ষণ করেন দুঃখের পথে। অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার দ্বারা পূর্ণের সঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আনন্দময় হবে, এই অভিপ্রায় আছে বিশ্বমানবের মধ্যে। তাঁর প্রতি প্রেমকে জাগরিত করে তাঁরই প্রেমকে সার্থক করব, যুগে যুগে এই প্রতীক্ষার আহবান আসছে আমাদের কাছে।

সেই আহবানের আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে অজানার দিকে, এই যাত্রার ইতিহাসই তার ইতিহাস। তার চলার পথপার্শ্বে কত সাম্রাজ্য উঠল এবং পড়ল, ধনসম্পদ হল স্তুপীকৃত আবার মিলিয়ে গেল ধূলোর মধ্যে। তার আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার জন্যে কত প্রতিমা সে গড়ে তুললে আবার ভেঙে দিয়ে গেল, বয়স পেরিয়ে ছেলেবেলাকার খেলনার মতো। কত মায়ামন্ত্রের চাবি বানাবার চেষ্টা করলে—তাই দিয়ে খুলতে চেয়েছিল প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডার, আবার সমস্ত ফেলে দিয়ে নূতন করে খুজতে বেরিয়েছে গহনে প্রবেশের গোপন পথ। এমনি করে তার ইতিবৃত্তে এক যুগের পর আর এক যুগ আসছে—মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করেছে অন্নবস্ত্রের জন্যে নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে; সেই সত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকর্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা-মত-বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো; যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই। প্রভূত হয়েছে মানুষের ভুলভ্রান্তি, পথে পথে তারা প্রকাণ্ড ভগ্ন-স্তুপে ছড়িয়ে আছে; মানুষের দুঃখব্যথার আঘাত হয়েছে অপরিসীম, তারা অবরুদ্ধ সার্থকতার শৃঙ্খল-ছেদনের কঠিন অধ্যবসায়; এ-সমস্ত এক মুহূর্তও কে সহ্য করতে পারত, মানুষের অন্তরবাসী ভূমার মধ্যে যদি এর চিরন্তন কোনো অর্থ না থাকত। মানুষের সকল দুঃখের উপরকার কথা এই যে-মানুষ আপন চৈতন্যকে প্রসারিত করছে আপন অসীমের দিকে, জ্ঞানে প্রেমে কর্মে বৃহত্তর ঐক্যকে আয়ত্ত করতে চলেছে; আপনার সকল মহৎ কীর্তিতে তাঁর নিকটতর সামীপ্যপাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে যাঁকে তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি। মানুষ হয়ে জন্মলাভ করে আরাম চাইবে কে, বিশ্রাম পাব কোথায়; মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।" (রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৫৯৩-৫৯৪ পৃঃ)

সেখানে এই বক্তব্যের পরই কবি উদ্ধৃত করেছেন "মহা বিশ্ব-জীবনের তরঙ্গেতে

নাচিতে নাচিতে" ইত্যাদি। যে উপলব্ধির পরিপূর্ণ প্রশান্ত এবং জ্ঞানালোকদীপ্ত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় 'মানুষের ধর্ম' এ, তারই—সুদীর্ঘ যাত্রার গোড়ারদিকের কথা প্রতিফলিত হয়েছে 'চিত্রা' কবিতা-গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে প্রথম জীবনের শান্তির পালা শেষ হওয়ার পর থেকেই তাঁর কবিতায় বিরাটচিত্তের সঙ্গে মানবচিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠতে লাগল। অশেষের দিক থেকে আহবান এসে পৌঁছাল অন্তরে। কিন্তু সে আহবান এসেছে আরামের শয্যা ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে রওনা হওয়ার আদেশরূপে। সেই আহবানে সাড়াদিয়ে তিনি বলেছেন,

"রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
আমার যামিনী?
জগতে সবারি আছে সংসার সীমার কাছে
কোনোখানে শেষ,
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ?
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান,
কোথা হতে তার মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহবান?"

কবি বলেছেন যে "এ আহবান এ তো শক্তিকেই আহবান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক; রসসম্ভোগের কুঞ্জকাননে নয়—সেইজন্যেই এর শেষ উত্তর এই—

"হবে, হবে, হবে জয় হে দেবী, করিনে ভয়
হব আমি জয়ী।
তোমার আহবানবাণী সফল করিব রাণী
হে মহিমাময়ী।
কাঁপিবেনা ক্লান্তকর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা,

নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি—
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান,
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহবান।" (ঐ, ১৯৩ পৃঃ)

কবি চলেছেন সত্যের সন্ধানে পথ হাতড়ে হাতড়ে। অনেক সময় পথ ভুল হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'জীবনদেবতা' তথা জীবনবেদ তাঁকে ঠিক পথে ফিরিয়ে এনেছে। এই সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

"পদে পদে তুমি তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনাব তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের'পরে
চলেছি পাগল বেশে।"

এই পথেব সন্ধান, আত্মদ্বন্দ্ব, অশান্তির মধ্য দিয়েই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁব ধর্মবোধ। জীবনে রুদ্রের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অশান্তির বহ্নিদাহনে জীবনবেদ খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে।

"এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনেব মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্বজীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময়-মাধুর্য আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে—

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।

জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ…
প্রণমি তোমারে।

*　　　*　　　*

হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব
অর্পিব পরাণ।
চাবনা পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।" (ঐ, ১৯৪ পৃঃ)

জীবনে দুঃখ বিপদ-বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব। এই ভাবটি এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বার বার প্রকাশ পেয়েছে। 'মরণ' কবিতাটি যে ঐ তাৎপর্য বহন করে সে সম্বন্ধে কবি নিজে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন,

"কহ মিলনের একি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ?

*　　　*　　　*

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
কোরো সব লাজ অপহরণ।
যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,

যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

মরণের এই ডাক আসলে মৃত্যুগহন পার হয়ে জীবনের জয়যাত্রারই ডাক। সেই কথাটা মনে রাখলে মৃত্যুকে নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও রূপক নাটকের সারমর্ম বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। দেখা যায় যে কবির বক্তব্যে দুর্জ্ঞেয় বা দুর্বোধ্য কিছু নেই। বিঘ্নবিপদ এবং অশান্তির ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন সম্মুখে এগিয়ে চলেছে। সেই সুর যে এই সময়কার সমস্ত রচনায় প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা ব্যাখ্যা করে কবি লিখেছেন,

"'খেয়া'তে 'আগমন' বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করে নি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘণ-ধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা

ওরে দুয়ার খুলে দে রে
বাজা শঙ্খ বাজা
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূণ্যতলে
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা,
ঝড়ের রাতে হঠাৎ এল
দুঃখ রাতের রাজা।

ওই 'খেয়া'তে 'দান' বলে একটি কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম কিন্তু কী পেলুম।

এতো মালা নয় গো, এযে
তোমার তরবারি
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি।

এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে। শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।" (ঐ, ১৯৭-১৯৮ পৃঃ)

সেই দান পেয়ে কবি গান গেয়ে উঠেছেন,

"আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়
আজ হতে মোব সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।"

এই অশান্তির সুরের মধ্যে দিয়েই বিবাট আহ্বান করছেন মানুষকে। জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বে মৃত্যুর বিভীষিকাব সম্মুখে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়েই প্রমাণ হয় জীবনেব শ্রেষ্ঠত্ব। জীবন বাব বাব মৃত্যুর উপরে জয়লাভ কবে নূতন রূপে দেখা দেয়। কবি বলেছেন যে 'শাবদোৎসব' থেকে আবম্ভ করে 'ফাল্গুনী' পযন্ত নাটকগুলির ভিতবকার ধুয়োটা ঐ একই। তিনি বলছেন যে 'শারদোৎসবের 'উপনন্দ' দুঃখেব সাধনা দিয়ে আনন্দেব ঋণ শোধ করছে।

"বিশ্বই যে এই দুঃখতপস্যায় রত, অসীমের যে দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানেব সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বাবা আপনাকে প্রকাশ কবছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যেব ঋণ শোধ কবছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তাব শ্রী, এই তো তাব উৎসব, এতেই তো সে শরৎ-প্রকৃতিকে সুন্দর কবেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয় কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই

কদর্যতা সেইখানেই—নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এইজন্যই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে—ভয়ে কিম্বা আলস্যে কিম্বা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যেলোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই—ওতো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।" (ঐ, ১৯৯ পৃঃ)

'ফাল্গুনী' নাটকের গোড়ার কথাও একই; যে মানুষ মৃত্যুকে ভয় পেয়ে এড়াতে চায় সে জীবনের মধ্যে বাস করেও প্রতিদিন মৃত্যুর বিভীষিকায় মরে। আর যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছোটে সে দেখে যে যাকে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, জীবন। সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে না পারলে মানুষ তার ছায়া দেখে ভয় পায়। কিন্তু সামনে গেলে ভয় ভেঙে যায়। 'ফাল্গুনী'তে যুবকেরা বেরিয়েছিল জরা বুড়োকে বেঁধে আনতে মৃত্যুকে বন্দী করতে। এগিয়ে যেয়ে তারা দেখে যে যে সর্দার জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই তাদের মৃত্যুর সিংহদ্বারের মধ্যে বহন করে নিয়ে চলেছে।

"চন্দ্রহাস। একী, এযে তুমি। ....সেই আমাদের সর্দার। বুড়ো কোথায়?

সর্দার। কোথাও তো নেই।

চন্দ্রহাস। কোথাও না?......তবে সে কী।

সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।......তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তারপর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক। যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম!......এতো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!"

ফাল্গুনীর মর্মবাণীটি বোঝাবার জন্য কবি 'আত্ম-পরিচয়' এ ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করে বলেছেন,

"মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা এই বসন্তোৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন করে নির্জীব করতে চায়—তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্ত্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে।" (ঐ, ২০১ পৃঃ)

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই জীবনদর্শনকে শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র মানবতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে ব্যক্তির জীবন। তেমনি ভাবেই এগিয়ে চলে মানুষের ইতিহাসের ধারা। 'রাজা' নাটক সম্বন্ধে কবি বলেন যে সুদর্শনা রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় মালা দিয়ে অগ্নিদাহের সৃষ্টি করেছিল। বিষম যুদ্ধ বেধেছিল বাইরে, ঘোর অশান্তি জেগেছিল অন্তরে। তাতেই ত' সুদর্শনাকে সত্যমিলনে পৌঁছিয়ে দিল।

"প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ" এই কথাটা তিনি 'অচলায়তন' নাটকের মধ্য দিয়েও বলতে চেয়েছেন। মনের এবং সমাজের, উভয়ক্ষেত্রেরই অচলায়তন ভেঙে পড়ে কঠিন সংঘাতে তবেই নবসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত হয়।

"যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম করে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে—আতঙ্কে সে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে, তাকে শত্রু বলেই মনে করি, তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়—কেননা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' 'অচলায়তনে' এই কথাটাই আছে—

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মানবে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি।

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেছি।" (ঐ. ২০০ পৃঃ)

প্রথম মহাযুদ্ধ সম্পর্কে কবি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে, সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন তার জন্যে আয়োজন অনেকদিন থেকে চলছিল। য়ুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিল—তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বলল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল—তাই তো যে ছিল রাণী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধূলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে। এই কথাটাই 'গীতালি'র একটি গানে আছে—

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ওযে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে করে নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আসছে জীবন মাঝে
ও যে আসছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে
যা আছে সব একেবারে

কর্‌বে অধিকার।
ওযে ভেঙেছে তোর দ্বার।”

(রচনাবলী, দশমখণ্ড, ১৯৯-২০১ পৃঃ)

কবি বলেছেন, “মানুষ তার জীবনকে সত্য করে, বড়ো করে, নূতন করে পেতে চাচ্ছে। তাই মানুষের সভ্যতায় তার যে জীবনটা বিকশিত হয়ে উঠছে, সে তো কেবলই মৃত্যুকে ভেদ করে। মানুষ বলেছে—

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে
তারপরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।” (ঐ, ২০২ পৃঃ)

কবির নিজের মনের বিকাশের ধারার এই দিকটি নিম্নউদ্ধৃত গানটিতে সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

“নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা।
কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়েব বাতি,
সংসাবের এই দোলায় দিলে
সংশয়েবি ঠেলা।
বারে বাবে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেছে,
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।”

জীবন ও মৃত্যু, স্বার্থ ও কল্যাণ, শক্তি ও প্রেম—এই বিপরীতের বিরোধের মধ্যে এগিয়ে চলতে চলতে দ্বন্দ্বের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন কবি। তিনি উপলব্ধি

করেছেন যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধই চরম কথা নয়।

"চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তাহলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তাহলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্—রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে তো সত্য নয়।

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলবনা আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।" (ঐ, ১৯৭-১৯৯ পৃঃ)

'ছোট-আমি' থেকে 'বড়-আমি'র দিকে যাত্রার জীবনদর্শন পরিপূর্ণরূপ পেয়েছে 'মানুষের ধর্মে'। বইটির ভূমিকাতেই বলা হয়েছে,

"মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রানির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি

একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।

কিন্তু, মানুষের আর-একটাদিক আছে যা এই ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ, যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমান কালের জন্যে বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিত কালের উদ্দেশে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি। সেখানে জ্ঞান উপস্থিত-প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে। সেখানে আপন স্বতন্ত্র জীবনের চেয়ে যে বড়ো জীবন সেই জীবনে মানুষ বাঁচতে চায়।

স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবপ্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।" (রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৫৬৮ পৃঃ)

এই ধর্মের সাধনা সহজ নয়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বড় কঠিন। তবু তাই হল মানুষের এগিয়ে চলার পথ। নিজের জীবনব্যাপী সাধনার উজ্জ্বল আলোকে সেই পথের রেখাকে তিনি উদ্ভাসিত করে তুলে ধরেছেন। কবির এই মানুষের ধর্মের প্রেরণাও আধ্যাত্মিক। তিনি সন্ধান করেছেন এমন এক সত্তার যিনি মানুষ হয়েও ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করেছেন, যিনি হলেন সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। কিন্তু সেই বিমূর্ত সত্তা কোন কল্পলোকে বিরাজিত নন, তিনি বিশ্বমানবতার মধ্যে প্রকাশিত। সকল মানবের ঐক্যবোধে হয় সেই সর্বজনীন মানবের অস্তিত্বের উপলব্ধি। কবির দৃষ্টিতে মানুষের সমগ্র ইতিহাসের গতি সেই ঐক্যবোধের অভিমুখে। জীবের সাথে মানুষের পার্থক্য এইখানে যে, মানুষ বোঝে তার সফলতা সহযোগিতায়।

"বুঝতে পারে, বহুর মধ্যে সে এক; জানে, তার নিজের মনের জানাকে বিশ্বমানবমন যাচাই করে, প্রমানিত করে, তবে তার মূল্য। দেখতে পায়, জ্ঞানে কর্মে ভাবে যতই সকলের সঙ্গে সে যুক্ত হয় ততই সে সত্য হয়। যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা। তাই মানুষের সেই প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়, যাকে সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে। বুদ্ধির বর্বরতা তাকেই বলে যা এমন মতকে এমন কর্মকে সৃষ্টি করে যাতে বৃহৎকালে সর্বজনীন মন আপনার সায় পায় না। এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ

হয়ে উঠছে; তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানাসমাজের নানাজাত, অন্তরে আছে এক মানব।" (ঐ, ৫৬৯ পৃঃ)

এই অন্তরবাসী মানব যে কোন অলৌকিক বা অতি-মানবিক সত্তা নয়, সে কথা সহজেই বোঝা যায়। 'মানুষের ধর্মে' কবি নানাভাবে তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই অন্তরের মানুষকে জানা ও পাওয়া যাবে কি ভাবে তা ব্যাখ্যা করার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে। একটি 'অহং' আর একটি আত্মা; প্রদীপের সঙ্গে একটিকে তুলনা করা যায়, আর একটিকে শিখার সঙ্গে। প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে। আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজারদর—কোনোটার দর সোনার, কোনোটার মাটির। শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে, এবং তারই প্রকাশে আর সমস্ত প্রকাশিত। প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে।

মানুষের আলো জ্বালায় তার আত্মা, তখন ছোট হয়ে যায় তার সঞ্চয়ের অহংকার। জ্ঞানে প্রেমে ভাবে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তিদ্বারাই সার্থক হয় সেই আত্মা। সেই যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, ভাবের যোগে অহংকার, কর্মের যোগে লোভ স্বার্থপরতা; ভৌতিক বিশ্বে সত্য আপন সর্বব্যাপী ঐক্য প্রমাণ করে, সেই ঐক্য-উপলব্ধিতে আনন্দিত হয় বৈজ্ঞানিক। তেমনি আত্মার আনন্দ আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি-দ্বারা, যে আত্মার সম্বন্ধে উপনিষদ বলেছেন 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্—সেই আত্মাকে জানো, সেই এককে, যাকে সকল আত্মার মধ্যে এক করে জানলে সত্যকে জানা হয়। প্রার্থনা মন্ত্রে আছে, য একঃ, যিনি এক, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার। যথৈবাত্মা পরস্তদ্বৎ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। আপনার মতো করে পরকে দেখবার ইচ্ছাকেই বলে শুভ-ইচ্ছা; সিদ্ধিলাভেও শুভ নয়, পুণ্যলোভেও শুভ নয়। পরের মধ্যে আপন চৈতন্য প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবাত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।

সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। যেহেতু ভগবান সর্বগত, সকলকে নিয়ে আছেন, সেই জন্যেই তিনি শিব। সমগ্রের মধ্যেই শিব, শিব

ঐক্যবন্ধনে। আচারীরা সামাজিক কৃত্রিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার সৃষ্টি করে তখন কল্যাণকে হারায়, তার পরিবর্তে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় তার নাম দিয়েছে পুণ্য। সেই পুণ্য আর যাই হোক সে শিব নয়। সেই সমাজবিধি আত্মাকে পীড়িত করে। স্বলক্ষণস্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে। আত্মার লক্ষণকে যে জানে সেই মুনি, সেই শ্রেষ্ঠ। আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, যে শুভবুদ্ধিতে সকলকে এক করে।" (ঐ, ৫৮৭ পৃঃ)

অহং এর প্রকৃতি সীমিত; তা মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টির দ্বারা আত্মাকে পাপের ভারে পীড়িত করে। এই তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন,

"মানুষ আপনার স্বভাবকে তখনই জানে যখন পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণের অর্থাৎ সর্বজনের হিতসাধন করে অর্থাৎ মানুষের স্বভাবকে জানে মানুষের মধ্যে যারা মহাপুরুষ। জানে কী করে। তেন সর্বমিদং বুদ্ধম্। স্বচ্ছ মন নিয়ে সমস্তটাকে সে বোঝে। সত্য আছে, শিব আছে সমগ্রের মধ্যে। যে পাপ অহং-সীমাবদ্ধ স্বভাবের, তার থেকে বিরত হলে তবে মানুষ আপনার আত্মিক সমগ্রকে জানে, তখনই জানে আপনার প্রকৃতি। তার এই প্রকৃতি কেবল আপনাকে নিয়ে নয়, তাঁকেই নিয়ে যাঁকে গীতা বলছেন, তিনিই পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব। মানুষ এই পৌরুষের প্রতিই লক্ষ্য করে বলতে পারে: ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্। মৃত্যুতে সেই পৌরষকে সে প্রমাণ করে যা তার দেবত্বের লক্ষণ, যা মৃত্যুর অতীত।" (ঐ, ৫৯১ পৃঃ)

সত্যকে শুধু জানা নয়, সত্য হওয়া এইটিই হল কবির জীবনবেদের মূলমন্ত্র।

"মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই—অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে।"

বাংলার নিরক্ষর বাউলদের একটি গানের কথা কবি বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ 'মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ'। সেই গানকে তিনি যে অর্থে নিয়েছেন তার ব্যাখ্যা আছে 'মানুষের ধর্মে।'

"সেই বাহিরে-বিক্ষিপ্ত আপনা-হারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম পথিক-ভিখারির মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

* * *

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে; আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক্।" (রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, ৫৮২ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের মতে সেই অন্বেষণের প্রেরণায়ই মানুষ বার বার নিজের জ্ঞান ও কর্মের সীমাকে অতিক্রম করে অশ্রান্ত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে দেশ ও কালের সীমাকে ছাড়িয়ে সর্বকালের সর্বমানবের ঐক্য-উপলব্ধির অভিমুখে।

"মানুষের দায়, মহামানবের দায়, কোথাও তাব সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। মানুষে মানুষে মিলিয়ে এই দেশ জ্ঞানে জ্ঞানে, কর্মে কর্মে। যুগযুগান্তবেব প্রবাহিত চিন্তাধারায় প্রীতিধারায় দেশেব মন ফলে শস্যে সমৃদ্ধ। বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল। যেসব দেশবাসী অতীতকালের, তাঁরা বস্তুত বাস করতেন ভবিষ্যতে। তাঁদের ইচ্ছার গতি কর্মের গতি ছিল আগামীকালের অভিমুখে। তাঁদের তপস্যার ভবিষ্যত আজ বর্তমান হয়েছে আমাদের মধ্যে কিন্তু আবদ্ধ হয় নি। আবার আমরাও দেশের ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করছি। সেই ভবিষ্যৎকে ব্যক্তিগতভাবে আমরা ভোগ করব না। যে তপস্বীরা অন্তহীন ভবিষ্যতে বাস করতেন, ভবিষ্যতে যাঁদের আনন্দ, যাঁদের আশা, যাঁদের গৌরব, মানুষের সভ্যতা তাঁদেরই রচনা। তাঁদেরই স্মরণ করে মানুষ আপনাকে জেনেছে অমৃতের সন্তান, বুঝেছে যে, তার দৃষ্টি তার সৃষ্টি তার চরিত্র মৃত্যুকে পেরিয়ে। মৃত্যুর মধ্যে গিয়ে যাঁরা অমৃতকে প্রমাণ করেছেন তাঁদের দানেই দেশ রচিত। ভাবী-কালবাসীরা, শুধু আপন দেশকে নয়, সমস্ত পৃথিবীর লোককে অধিকার করেছেন। তাঁদের চিন্তা, তাঁদের কর্ম, জাতিবর্ণ নির্বিচারে সমস্ত মানুষের। সবাই তাঁদের সম্পদের উত্তরাধিকারী। তাঁরাই প্রমাণ করেন সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে

অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে এক-মানুষ বিরাজিত। সেই মানুষকেই প্রকাশ করতে হবে, শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হবে বলেই মানুষের বাস দেশে। অর্থাৎ, এমন জায়গায় যেখানে প্রত্যেক মানুষের বিস্তার খণ্ড খণ্ড দেশকালপাত্র ছাড়িয়ে—যেখানে মানুষের বিদ্যা, মানুষের সাধনা সত্য হয় সকল কালের সকল মানুষকে নিয়ে।" (রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৫৭৪ পৃঃ)

সেই লক্ষ্যের দিকে নিজের যাত্রার কাহিনী রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন।

"বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে ভেদ, অহং আর আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ। মানবত্ব বলতে যে বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার পরিপূর্ণ সত্তা। তাই বলছি, যখন আমরা অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন আমরা মানবধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ, যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে তখন বিচ্ছেদ ঘটে।

জাগিয়া দেখিনু আমি, আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন গীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা, সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা নানা নাম দিই তাকে। 'অহং' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই 'অহং' এর খেলাঘরে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।" (ঐ, ৬০৮ পৃঃ)

এই মিথ্যা স্বপ্ন থেকে জাগরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। সেদিন যে মহাসাগরের গান তিনি শুনেছিলেন তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সারা জীবনের অবিশ্রান্ত যাত্রায় যতই সেই মহাসমুদ্রের নিকটবর্তী হয়েছেন ততই তার সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে। কবি যাকে বলেছেন 'মহাসাগর' সে জিনিষ কি? প্রশ্নের উত্তরে তিনি সংশয়ের অবকাশ রাখেন নি।

"সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। তাকেই এখন বলেছি বিরাট পুরুষ। সেই যে মহামানব তার মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে, কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে।

* * *

সেখানে যাওয়ার একটা ব্যাকুলতা অন্তরে জেগেছিল। মানবধর্ম সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেছি, সংক্ষেপে এই তার ভূমিকা। এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে মেলবারই এই ডাক।" (ঐ, ৬০৭ পৃঃ)

এই মহামানব কোন অতি-মানবিক সত্তা নয় এবং তার সঙ্গে মিলনের পথ ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধিতে নয়। কে সে মহামানব? এ প্রশ্নের জবাবও সন্দেহাতীত, দিবালোকের মতই উজ্জ্বল।

"পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরম জাগতিক সত্তা আছে। সূর্যলোককে ছাড়িয়ে যেমন আছে নক্ষত্রলোক। কিন্তু যার অংশ এই পৃথিবী, যার উত্তাপে পৃথিবীর প্রাণ, যার যোগে পৃথিবীর চলাফেরা, পৃথিবীর দিনরাত্রি, সে একান্তভাবে এই সূর্যলোক। জ্ঞানে আমরা নক্ষত্রলোককে জানি কিন্তু জ্ঞানে কর্মে আনন্দে দেহমনে সর্বতোভাবে জানি এই সূর্যলোককে। তেমনি জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহ মন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়; আমাদের ধর্মশ্চ কর্মশ্চ, আমাদের ঋতং সত্যং, আমাদের ভূতং ভবিষ্যৎ সেই সত্তারই অপর্যাপ্তিতে।

মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালোমন্দ সুন্দর অসুন্দরের ভেদ বর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপপুণ্যের কথা উঠতে পারে না। অত্রীতি ক্রবতোহন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে। তিনি আছেন, এ

ছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না। মানবমনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন-সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে কিনা, আমার মন নিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে। আমরা সত্তামাত্রকে যেভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। এই কারণেই দোষারোপ করে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে শূণ্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না। এমন নাস্তিবাদের কথাও মানুষ বলেছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তা বললে তার ব্যবসা বন্ধ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় আমরা যে জগৎকে জানি বা কোনোকালে জানবার সম্ভাবনা রাখি সেও মানবজগৎ। অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধির যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোনো চিত্ত কোথাও থাকতেও পারে যার উপলব্ধ জগৎ আমাদের গাণিতিক পরিমাপের অতীত, আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে যে বিরাজ করে না। কিন্তু, যে জগতের গূঢ় তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কী করে। এইজন্যে কোনো আধুনিক পণ্ডিত বলেছেন, বিশ্বজগৎ গাণিতিক মনের সৃষ্টি। সেই গাণিতিক মন তো মানুষের মনকে ছাড়িয়ে গেল না। যদি যেত তবে এ জগতের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমরা জানতেই পারতুম না, যেমন কুকুর বিড়াল কিছুতেই জানতে পারে না। যিনি আমাদের দর্শন শাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সর্বেন্দ্রিয় গুণাভাসম্। অর্থাৎ মানুষের বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের যতকিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে, মানবব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।" (ঐ, ৫৮৪-৫৮৫ পৃঃ)

অথর্ববেদের একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করতে যেয়ে কবি বলেছেন, "কিন্তু, মানুষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছেন, ঋতং সত্যম্। এ সমস্তই বিশ্বমানবমনের ভূমিকায়, যারা একে স্বীকার করে তারাই মনুষ্যত্বের পদবীতে এগোতে থাকে। অথর্ববেদ যে-সমস্ত গুণের কথা বলেছেন তার

সমস্তই মানবগুণ। তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্মসীমার অতিরিক্ত সত্তাকে উপলব্ধি করি তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানবব্রহ্ম। আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি।" (ঐ, ৫৮৩ পৃঃ)

'মানুষের ধর্ম' বইটির উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে জীবনদেবতা আছেন বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। নিজের সাধনার চরিত্র সম্বন্ধে দৃপ্ত ঘোষণা করে বলেছেন,

"অন্তত, আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেননা, আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি, তা মানবচিত্ত কখনোই ছাড়াতে পারেনা। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানববুদ্ধিতে প্রমানিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি কবি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি; তবে মানুষ হলুম কেন।" (ঐ, ৬১২-৬১৩ পৃঃ)

সেই নিখিল মানবের আত্মা, মানবিক ভূমা বা নিখিল মানবমনের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়াই যেমন রবীন্দ্রনাথের নিজের সাধনা তেমনি তার মধ্যেই তিনি দেখেছেন মানবতার ইতিহাসের পরম সত্যটিকে। সেই বাণীই রেখে গেছেন আমাদের সকলের জন্য উত্তরাধিকার রূপে।

(৫)

সংগ্রামী অভিজ্ঞতা

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের পটভূমি সুবিশাল। সে জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ও কর্মের পরিধি দিগন্ত প্রসারিত। মানুষের চিন্তার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তিনি আলোচনা ও দিকনির্দেশ করে গেছেন। স্বদেশ এবং বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যায় অংশগ্রহণ করেছেন নানা ভাবে। তাই তাঁর মনে সে যুগচেতনার প্রতিফলনের প্রক্রিয়াটিকে অধ্যয়ন করা একটি কঠিন ও সহিষ্ণু পরিশ্রম-সাপেক্ষ কাজ। সৌভাগ্যক্রমে কবি জীবনীকার শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় এই বিষয়ে গবেষণার একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি রচনা করেছেন।

রবীন্দ্র জীবনদর্শনের মূল সুরটির বিকাশের ধারা যে সরলরেখায় অগ্রসর হয়নি সেকথা এখানে নূতন করে বলার দরকার নেই। বাইরের ও ভিতরের অনেক পিছুটান এবং মতসংঘাতের মধ্য দিয়ে তা এগিয়ে এসেছে। অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে কবির মধ্যে স্ব-বিবোধিতা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু প্রতি স্তরে সেই স্ব-বিরোধিতাকে অতিক্রম করে অগ্রগমণের সত্যটিও সন্দেহাতীত ভাবে প্রকাশিত। একটি মাত্র অধ্যায়ে তার সমগ্র রূপটিকে পরিস্ফুট করে তোলা সম্ভব নয়। তাই শুধু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের দৃষ্টান্তের সাহায্যে উপরোক্ত প্রক্রিয়ার চরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে কবির মনোজগতে জাগরণ সুরু হয় তার একটি সুন্দর রূপরেখা অঙ্কিত করেছেন কবি-জীবনীকার। রামমোহন যে যুগের সূচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে তা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। যে ঘন-তমিস্রার ভিতরে রামমোহন মোহমুক্ত জ্ঞান এবং উদার মানবিকতার দীপশিখা প্রজ্বলিত করেছিলেন তা সম্পূর্ণ অপনোদিত না হলেও আলোকবৃত্তের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। কবির জন্মগ্রহণের মাত্র কয়েক বছর আগে সংঘটিত হয়েছে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ। বাংলা ও বাঙ্গালীর চিন্তাজীবনে তার প্রত্যক্ষ রেখাপাত খুব স্পষ্ট নয় ঠিকই। তবু মানুষের স্মৃতিতে তার প্রভাব অত্যন্ত সজীব। অন্যদিকে কবির জন্মের ঠিক আগের পাঁচটি বছরে এমন আরো

অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে যার প্রভাব বাঙ্গালীর নবচেতনার জাগরণের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলির মধ্যে পড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের অগ্রগতি, বিধবাবিবাহ এবং স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে বিদ্যাসাগরের সাহসী পদক্ষেপ, নীলবিদ্রোহ এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সেই বিদ্রোহের প্রতি নির্ভীক সমর্থন জ্ঞাপন, বাংলার প্রত্যন্তসীমায় সাঁওতাল বিদ্রোহ, বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন এবং দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাবে নবযুগের প্রাণচাঞ্চল্য, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার অভ্যুদয়, দেশীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে যুগচেতনার আত্মপ্রকাশ। প্রত্যেকটি ঘটনা বাঙ্গালীকে মধ্যযুগীয় কূপমণ্ডুকতা এবং অনড় অচল সংস্কারের ও প্রথার দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তার সামাজিক চরিত্র ও পরিবেশ তাঁর মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে। অর্থনৈতিক বিচারে বলা যায় যে কয়েক-পুরুষ ধরেই সে পরিবারের জীবনের সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির ফাটল ক্রমশ প্রসারিত হয়ে চলেছে এবং তা এদেশের উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। কবির পিতা দেবেন্দ্রনাথের সময়ে তার সংসারের মানসিক বায়ুমণ্ডলে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব থাকলেও সামন্তযুগীয় সংস্কার এবং ধ্যানধারণার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেছে। 'আত্ম-পরিচয়' এর পৃষ্ঠায় কবি তার একটি সুন্দর চিত্র এঁকে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে তাঁর জন্মের আগেই তাঁদের পরিবার সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি সমস্তই সেখানে ছিল বিরল। তিনি আরো লিখেছেন,

"আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে-সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারিদিকে। বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়েছিল, তার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমার ছিল না। সাম্প্র-দায়িক গুহাচর যে-সকল অনুকল্পনা, যে-সমস্ত কৃত্রিম আচার-বিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত করে আছে, বহু শতাব্দী জুড়ে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত আকারে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির দুর্বারতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে মজ্জাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত করে তুলেছে, মধ্যযুগের

অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্যদেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে নয় অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হয়েছে, কিন্তু যা আমাদের দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্র-নীতিতে কী সমাজ-ব্যবহারে মারাত্মক সংঘাতরূপ ধরেছে, তার চলাচলের কোনো চিহ্ন সদরে বা অন্দরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিল না। একথা বলবার তাৎপর্য এই যে, জন্মকাল থেকে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণযুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয়নি।" (রচনাবলী, দশমখণ্ড, ২১৯ পৃঃ)

সেই পরিবার থেকে তখন এদেশীয় সামাজিক জীবনের স্রোত যেমন সরে গেছে তেমনি পূর্বতন ধনের স্রোতেও ভাঁটা পড়েছে। কবি লিখেছেন,

"পিতামহের ঐশ্বর্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল, সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটি মাত্র কম্পমান ক্ষীণশিখা। প্রচুর উপকরণ-সমাকীর্ণ পূর্বকালের আমোদ-প্রমোদ বিলাস সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে তাদের কোনো অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।" (ঐ, ২০৮ পৃঃ)

উপরোক্ত পরিবেশেই বাল্যকালে তাঁর সাথে উপনিষদীয় চিন্তার পরিচয় হয়। সেখানে ধর্মসাধনায় প্রচলিত ভাবাবেগের উদ্‌বেলতা আত্ম-প্রকাশ করতে পারেনি। কবির পিতার প্রবর্তিত উপাসনার চরিত্র ছিল শান্ত সমাহিত। উপনিষদের সাথে কবির পরিচয় হয়েছে বিরোধের মধ্য দিয়ে। 'মানুষের ধর্ম' বইয়ের পরিশিষ্টে তিনি লিখেছেন যে উপনিষদের মন্ত্র কণ্ঠস্থ এবং প্রাত্যহিক নিয়ম হিসাবে উচ্চারণ করার পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাল্যে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। মন্ত্রগুলিকে তিনি সব সময় যথোচিত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতে পারেন নি। তবু তা মনের প্রসারে সাহায্য করেছে।

অল্প বয়স থেকেই কবি একদিকে সামন্তযুগীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা লাভ করেছেন অন্যদিকে জাতীয় জাগরণের কর্মকাণ্ডের অপর দিকটির অর্থাৎ পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের প্রয়াসের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছে। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেওয়ার আগেই তিনি 'হিন্দু মেলায়' অংশগ্রহণ করেছেন এবং বৈপ্লবিক কাজ করার উদ্দেশ্যে

স্থাপিত 'সঞ্জীবনীসভা' নামক গুপ্তসমিতির সভ্য হয়েছেন। পরিণতবয়সে তিনি অবশ্য সঞ্জীবনী সভার মূলে ছিল যে স্বপ্নিল রোম্যান্টিকপ্রবণতা, তার চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। কিন্তু ঐ বয়সে মনের বিকাশে রোম্যান্টিক দেশপ্রেম যে অবদান দিয়েছে তাকে ছোট করে দেখা চলে না। বাংলা দেশের বিপ্লবী তরুণসমাজ নিজ অভিজ্ঞতায় সে কথা ভালকরেই বুঝেছে।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সামন্তযুগীয় সংস্কার, রক্ষণশীলতা এবং অতীত-মুখীনতার বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। ১৮৮৪ সালের (ইং) কাছাকাছি সময়ের কথা। দেশে নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ সনাতনপন্থী পণ্ডিত হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নামে অনেক আজগুবি মতামত প্রচার করেন। সমাজে প্রচলিত সমস্ত আচার অনুষ্ঠানকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণ করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ মনীষীরাও সেই প্রচেষ্টার সাথে নিজেদের জড়িত করেন। তাঁদের সেই সব মতামতের বিরুদ্ধে লেখনীধারণ করে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি প্রবন্ধরচনা করেন। শুধু প্রবন্ধই নয়, 'হিঁদুয়ানি'র নামে অবাস্তব ধর্মমোহের আস্ফালনকে সুতীক্ষ্ণ শ্লেষের আঘাতে জর্জরিত করে কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতাও রচনা করেন। নাটকে প্রহসনেও সেই আক্রমণ রূপায়িত হয়। একখানি পত্র-কবিতা থেকে কিছু নমুনা উদ্ধৃত করেছেন শ্রী প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

"ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মত গজিয়ে ওঠে।
ছুঁচলো সব জিভের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, আমি কল্কি—গাঁজার কল্কি হবে বুঝি—
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিঘুঁজি ?"

(রবীন্দ্র জীবন কথা, ৪৭ পৃঃ)

তখন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নব আবিষ্কৃত আর্যজাতিতত্ত্ব থেকে এদেশে আর্যামি কথাটা এবং আর্যত্বের অভিমান দেখা দিচ্ছে। তাকে বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

"মোক্ষমূলার বলেছে 'আর্য'
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড়োবলে করেছি ধার্য,

আরামে পড়েছি শুয়ে।
মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই করিয়াছি ঠিক—
এ যে নাহি বলে ধিক তারে ধিক্,
শাপ দি পৈতে ছুঁয়ে।" (ঐ, ৪৮ পৃঃ)

এই বিদ্রূপের চরম অভিব্যক্তি হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত কবিতায়।

"রব উঠেছে ভারতভূমে হিঁদু মেলাই ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন ভয় নেইক আর।
লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল
দামু বলছে মিথ্যে কথা চামু দিচ্ছে গাল……
এমন হিঁদু মিলবে নারে সকল হিঁদুর সেরা,
বোসবংশ আর্যবংশ সেই বংশের এঁরা।
কলির শেষে প্রজাপতি তুলেছিলেন হাই,
সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন আর্য দুটি ভাই,
আর্য দামু, আর্য চামু।" (ঐ)

সনাতন পন্থীদের অতীতমুখীনতা ও রক্ষণশীলতার মূল কারণগুলি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধুমাত্র তাদের আক্রমন ও মতামত-খণ্ডনে নিজের চেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথের ঐ সব বক্তব্যের মধ্যে তৎসাময়িকতার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অনেক জিনিষ আছে। 'সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধমালার 'হিন্দুবিবাহ' নামক প্রবন্ধে তিনি লেখেন,

"সম্প্রতি আমাদের দেশে একদলের মধ্যে এই যে প্রাচীনতার একান্ত পক্ষপাত দেখা যায়, তাহার কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমত, নূতন শিক্ষার প্রভাবে আমরা অনেকগুলি নূতন কর্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু আমাদের অনভ্যাস, পূর্বরাগ, স্বাভাবিক জড়ত্ব ও ভীরুতাবশত আমরা তাহা সমস্ত পালন করিয়া উঠিতে পারি না। আলস্যের দায়ে ও সমাজের ভয়ে অনেক সময়ে আমরা তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকি। কিন্তু অসম্পন্ন কর্তব্যের লাঞ্ছনা মানুষ চিরদিন সহিয়া থাকিতে পারে না। কেন বিশ্বাস করিতেছি একরূপ এবং কাজ করিতেছি অন্যরূপ, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কিছুদিন পরে নূতন বিশ্বাসের

খুঁত ধরিতে আরম্ভ করা যায়। নূতন শিক্ষালব্ধ কর্তব্য যে অকর্তব্য, এবং আমরা যাহা করিয়া আসিতেছি ঠিক তাহাই করা যে উচিত, প্রাণপন সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ স্থলে যুক্তি-গুলি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে; এত সূক্ষ্ম হয় যে সেই যুক্তি ভেদ করিয়া যুক্তিকর্তার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস কথনো কথনো কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, পুরাতনের উপর যখন একবার আমাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়, তখন আমরা অনেক সময় অবিচারে নূতনকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিই। নূতনের উপর বিশ্বাসবশতই যে তাহাকে সকল সময়ে আমরা হৃদয়ে স্থান দিই তাহা নহে, অনেক সময় পুরাতনের প্রতি আড়ি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনি। আমরা গৃহশত্রুর প্রতি আড়ি করিয়া কথনো বহিঃশত্রুকে গৃহে আহবান করিয়া থাকি। অবশেষে উপদ্রব সহ্য করিয়া যখন চৈতন্য হয় তখন আগাগোড়া নূতনের উপর বিরাগ জন্মে। যখন এদেশে নূতন কলেজ হয় তখন শিক্ষিত যুবকেরা যে অনেকগুলি উৎপাত আপন গৃহচালের উপরে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, সে কেবল পুরাতনের উপরে আড়ি করিয়া বইত' নয়। এখনকার একদল লোক সেই সকল উৎপাতমিশ্রিত নূতন মতকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন।

তৃতীয়ত, আমরা পরাধীন জাতি। আমরা পরের কাছে অপমানিত, সুতরাং ঘরে সম্মানের প্রত্যাশী। এই জন্য আমরা ইংরেজকে বলিতে চাহি—ইংরেজ, তোমাদের শস্ত্র বড়ো, কিন্তু আমাদেব শাস্ত্র বড়ো; তোমরা রাজা, আমরা আর্য। এককালে আমাদের যাহাছিল এখনও যেন তাহাই আছে, এইরূপ ভান করিয়া অপমানদুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাই। দেহে বল ও হৃদয়ে সাহস নাই যে অপমান হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারি, সুতরাং পুরাণ ও সংহিতা, চটুল রসনা ও কূটযুক্তিব দ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া মনে কবিতে ইচ্ছা হয়। যে সকল আচারের অস্তিত্ব হয়তো আমাদের অপমানের অন্যতম কারণ—সেগুলি দূর করিতে সাহস হয় না, এইজন্য তাহাদের প্রতি আর্য আধ্যাত্মিক পবিত্র প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া আপনাদিগকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করি। এইরূপে

অনেক সময় অপমান-জ্বালা বিস্মৃত হইবার অভিপ্রায়েই আমরা অপমানের কারণ স্বহস্তে স্বদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিই।

চতুর্থত, ভাবেগতিকে বোধহয়, কেহ কেহ মনে করেন প্রাচীনতাকে অবলম্বন করা আমাদের political উন্নতির পক্ষে আবশ্যক। তাহাকে বিশ্বাস করি বা না করি, তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করিলে আমাদের কতকগুলি বিষয়ে কতকগুলি লাভ আছে। কিন্তু সত্যমিথ্যার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া এরূপ লাভ ক্ষতি গণনা করিয়া যে দেশের কোনো স্থায়ী ও বৃহৎ কাজ করা যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে।" (রচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড, ৭৪-৭৫ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের সাহায্যে আমাদের পক্ষে তখনকার কয়েকটি বিরাট ব্যক্তিত্বের স্ব-বিরোধিতার কারণ বোঝা সহজ হয়। জাতীয় জাগরণের তখনকার অনেক নেতার মধ্যে রাজনীতিতে চরমপন্থা অথচ সামাজিক বিষয়ে রক্ষণশীলতার সহ-অবস্থান দেখা যায়। তার কারণগুলিকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এমন কি কয়েকটি বিষয়ে তাঁর নিজেরও স্ব-বিরোধিতার ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায়।

নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথ নূতনের পক্ষ গ্রহণ করেন দ্বিধাহীন ভাবে। কিন্তু নূতনপন্থীদের বে-পরোয়া ভাঙনের নীতি ও স্বদেশের অতীত সম্বন্ধে নেতিবাচক মনোভাবকে তিনি সমর্থন করেন নি। তিনি সব সময় চেষ্টা করেছেন ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে সকলের সামনে তুলে ধরতে। কিন্তু সেই কাজ করতে যেয়ে এই সময়ে তিনি বহুক্ষেত্রে নিজ মতামত এরূপ ভাবে প্রকাশ করেছেন যাকে অতীতমুখীনতা বলে মনে হতে পারে। কবি-জীবনীকার বলেছেন যে কবির মধ্যে বিংশশতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত একটা 'ঐকান্তিক হিন্দু' মনোভাব দেখা যায়। তিনি তখন হিন্দু-জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়, অনেকের মধ্যেই তা দেখা গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার কারণ কিছু পরিমানে যেমন খুঁজে পাওয়া যায় উপরোক্ত বিশ্লেষণের মধ্যে তেমনি পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাহায্যে আমরা তাকে বুঝতে পারি আরো বিশদভাবে। তখন একদিকে ইংরাজ শাসকের তরফ থেকে প্রবল ভাবে ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে প্রচার চলেছে। তারা বুঝিয়ে দিতে চাইছে যে ভারতবাসী

সমস্ত দিক থেকে হীন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচারে অনেক পশ্চাৎপদ এবং ভারতবাসীকে সেই হীনতা থেকে উদ্ধারের জন্যই এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আশীর্বাদ বহন করে ইংরাজ শাসনের আবির্ভাব হয়েছে। একদিকে বিদেশী শাসক এই ধারণাকে ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্য দিকে তখন যে সব ভারতীয় সামাজিক-প্রগতির পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের অনেকেরই চোখ ইউরোপীয়-সভ্যতার দীপ্তিতে ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা মনে প্রাণে আচরণে ইংরাজে পরিণত হয়েছিলেন এবং দেশের সাধারণ মানুষের সাথে তাঁদের হৃদয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু, রাজনীতিতে তাঁরা ছিলেন নরমপন্থী, বিদেশীশাসকের দরবারে আবেদন নিবেদন পেশ করাই ছিল তাঁদের একমাত্র কর্মসূচী। সুতরাং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে নবজাগ্রত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা ভিন্নপথ অনুসরণ করতে চেয়েছে। দেশাভিমান প্রেরণার উৎস খুঁজেছে ভারতের অতীত গৌরবকাহিনীতে, তার সুপ্রাচীন চিন্তার ভাণ্ডারে। এই পন্থার প্রবক্তাদের মধ্যে ঘটেছে একদিকে রাজনৈতিক চরমপন্থা এবং অন্যদিকে অতীতমুখীনতার সংমিশ্রণ। ভারতের জাতীয় জাগরণ যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টারূপে আত্মপ্রকাশ করেনি, তার অন্যতম কারণ ছিল এই হিন্দু-জাতীয়তার মনোভাব। রবীন্দ্রনাথ কিছু পরিমাণে সেই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর উদার যুক্তিধর্মী মন অল্পদিনেই সে প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ পথের দিশার সন্ধানে রামমোহনের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে কথা পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। হয়ত সেইজন্যই তাঁর নব-হিন্দুত্বের ধারণা 'উগ্রহিন্দুজাতীয়তার' পঙ্কে নিমজ্জিত হয় নি।

মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে হিন্দু-জাতীয়তার আন্দোলন জন্মগ্রহণ করে। শিবাজী-উৎসব, সার্বজনিক গণপতিপূজা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে উগ্র-হিন্দুজাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। তার সাথে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ছিল না। শিবাজী-উৎসব উপলক্ষ্যে তিনি যে কবিতা রচনা করেন তাতে হিন্দু-জাতীয়তা অপেক্ষা ভারতের ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

"সেদিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ

শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন—
দরিদ্রের বল।
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।"

রবীন্দ্রনাথের মিল ছিল রামেন্দ্রসুন্দর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতির সাথে। তাঁরা ভাবতেন যে হিন্দুধর্মের সত্য আদর্শ বলে যে বস্তুকে তাঁরা জেনেছিলেন তার ভিত্তিতে বিপুল অথচ দুর্বল হিন্দুসমাজকে জাগ্রত করতে এবং এই জনশক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। তাহলেই ভারতের সমস্যার সমাধান হবে।

বিংশতাব্দীর গোড়ার দিকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বমূলক প্রবন্ধসমূহ পর্যালোচনার দ্বারা দেখা যায় যে তিনি নব্যহিন্দুত্বের মোহ কাটিয়ে উঠে ধর্মের সার্বজনীন আদর্শের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক সমস্যার জটিল ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেন যে হিন্দু-জাতীয়তাতে ভারতের আদর্শের সমগ্রতা নেই। তিনি তাই ঘোষণা করেন ভারতের ইতিহাস কারও স্বতন্ত্র ইতিহাস নয়।

কবির এই সময়ের বক্তব্যে দেখা যায় যে তিনি ধর্মের বিশিষ্টতা ও বিশ্বজনীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বিশেষ দেশে উদ্ভূত এবং বিশেষ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম যে সার্বজনীন হতে পারে, এই শিক্ষাই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

হিন্দুসমাজে ধর্মের নামে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত লোকাচার ও অন্ধসংস্কারের আবর্জনা মানুষের মনকে পঙ্গু করেছে, মানুষকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করেছে। তার বিরুদ্ধে কবি ক্রমশ উদার যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী আদর্শকে ঊর্ধে তুলে ধরেছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ এবং দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও নাটকে সেই চিন্তাধারা সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশিত।

মোহান্ধ সংস্কারানুবর্তিতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমাহীন আক্রমণের

একটি শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি হল 'অচলায়তন' নাটক। নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর রক্ষণশীলেরা কবির উপরে ভীষণভাবে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে। সেই কোলাহলের জবাবে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন,

" 'অচলায়তন' লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকে বলে নিস্ফলতা।.........নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সেই তার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। ....অন্তরের যে সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে, বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র.........আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে—যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি?" (রবীন্দ্র-জীবন কথা, ১২১ পৃঃ)

ধর্মবোধের সঙ্গে ধর্মের প্রচলিত ধারণার পার্থক্য বোঝানর উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রবন্ধে ধর্ম ও ধর্মতন্ত্রের প্রভেদ ব্যাখ্যা করেছেন।

"মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধূ ধূ করে তার উপরে সেই অচলতাটাকে লইয়াই যখন মানুষ বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্মবলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ-কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দ পুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ।

ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতো বড়ো অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।" ('কালান্তর' শীর্ষক প্রবন্ধ সংগ্রহের অন্তর্গত, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ)

কবি জীবনেরযাত্রায় যত সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছেন ততই দেখা যায় যে ধর্মতন্ত্র বা ধর্মমোহের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ শাণিত হয়ে উঠেছে। কলকাতায় ১৯২৫ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় বিক্ষুব্ধ হয়ে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন,

"এই মোহমুগ্ধ ধর্ম-বিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। ....আজ মিছে ধর্মকে পুড়িয়ে ফেলে ভারত যদি খাঁটি ধর্ম, খাঁটি নাস্তিকতা পায়, তবে ভারত সত্যই নবজীবন লাভ করবে।" (রবীন্দ্রজীবন কথা, ১৯৮ পৃঃ)

তারই কয়েকদিন পরে তিনি 'ধর্মমোহ' নাম দিয়ে কবিতায় লেখেন,

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।" (ঐ)

কয়েক বছর পরে 'হিন্দু-মুসলমান' নামক প্রবন্ধে তিনি লেখেন,

"যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রীক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে ?

ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেছে, যখন কোনো মহাজাতি নব-জীবনের প্রেরণায় রাষ্ট্রবিপ্লব প্রবর্তন করেছে তার সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্ম-বিদ্বেষ। দেড়শত বৎসর পূর্বেকার ফরাসি-বিপ্লবে তার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সোভিয়েট রাশিয়া প্রচলিত ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর। সম্প্রতি স্পেনেও এই ধর্ম-হননের আগুন উদ্দীপ্ত। মেক্সিকোয় বিদ্রোহ বারে বারে রোমক চার্চকে আঘাত করতে উদ্যত।

* * *

আজ সেই দেশেই প্রজা যথার্থ স্বাধীনতা পেয়েছে যে দেশে ধর্মমোহ মানুষের চিত্তকে অভিভূত করে এক দেশবাসীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য বা বিরোধকে নানা আকারে ব্যাপ্ত করে না রেখেছে।" (রচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড ৩৬৩ পৃঃ)

সোভিয়েট রাশিয়ায় নতুন সমাজ গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে ধর্মের প্রভাব মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই নাস্তিকতাকে অভিনন্দন জানিয়ে 'রাশিয়ার চিঠি'তে লেখেন,

"যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্প কালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেন না, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন করে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক না। এ-পর্যন্ত দেখাগেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেন না তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা রুশসম্রাটকৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে।" (রচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড, ১০২ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ এখন নব-হিন্দুত্বের ধারণাকে পিছনে ফেলে কতদূর অগ্রসর হয়ে এসেছেন তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মের আবরণে

মানবপ্রেম প্রচার করলে যে তার আবেদন খণ্ডিত; এমন কি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে সে কথা তিনি ক্রমেই স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করেছেন। ইংরাজী ১৯২২ সালে 'হিন্দু-মুসলমান' প্রসঙ্গে তিনি একটি চিঠিতে লেখেন, "ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে—ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্য পক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কী করে মিলবে? এক সময়ে ভারতবর্ষে গ্রীক পারসিক শক নানা জাতির অবাধ সমাগম ও সম্মিলন ছিল। কিন্তু মনে রেখো সে 'হিন্দু'যুগের পূর্ববর্তীকালে। হিন্দুযুগ হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়ার যুগ—এই যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সচেষ্টভাবে পাকা করে গাঁথা হয়েছিল। দুর্লঙ্ঘ্য আচারের প্রাকার তুলে একে দুষ্প্রবেশ্য করে তোলা হয়েছিল। একটা কথা মনে ছিল না, কোনো প্রাণবান জিনিসকে একেবারে আটঘাট বন্ধ করে সামলাতে গেলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাই হোক্, মোট কথা হচ্ছে, বিশেষ এক সময়ে বৌদ্ধযুগের পরে রাজপুত প্রভৃতি বিদেশীয় জাতিকে দলে টেনে বিশেষ অধ্যবসায়ে নিজেদেরকে পরকীয় সংস্রব ও প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যেই আধুনিক হিন্দুধর্মকে ভারতবাসী প্রকাণ্ড একটা বেড়ার মতো করেই গড়ে তুলেছিল। এর প্রকৃতিই হচ্ছে নিষেধ এবং প্রত্যাখ্যান। সকল প্রকার মিলনের পক্ষে এমন সুনিপুণ কৌশলে রচিত বাধা জগতে আর কোথাও সৃষ্টি হয় নি। এই বাধা কেবল হিন্দু-মুসলমানে তা নয়। তোমার আমার মত মানুষ যারা আচারে স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই, আমরাও পৃথক, বাধাগ্রস্ত। সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কোথায়? মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে। ধর্মকে কবরের মতো তৈরি করে তারই মধ্যে সমগ্র জাতিকে ভূতকালের মধ্যে সর্বতাভাবে নিহিত করে রাখলে উন্নতির পথে চলবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে কারও মেলবার উপায় নেই। আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে যে অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচাতে না পারলে আমরা কোনো রকমের স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষার দ্বারা,

সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে—ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে—তারপরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই—কারণ, অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে, গুটির যুগ থেকে ডানামেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব—যদি না আসি তবে, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" (শ্রী কালিদাস নাগকে লিখিত চিঠি, রচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড, ৩৫৭-৩৫৮ পৃঃ)

কয়েকবৎসর পরে রচিত উপরোক্ত 'ধর্মমোহ' কবিতাটিতে তিনি আহবান জানান

"হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"
(ধর্মমোহ, পরিশেষ)

১৯৩৫ সালে তিনি 'রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক' কমিটির দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। কবি-জীবনীকার লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোন ভাষণ দেন নি বা কোন উক্তি করেন নি। ধর্ম মহাসম্মেলনে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাতে পরমহংসদেবের ধর্মমত বা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলে তিনি শুধু বুঝিয়েছিলেন ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকার কী সর্বনাশা পরিণাম। (রবীন্দ্রজীবনকথা, ৩৫১ পৃঃ) ঐ ভাষণে তিনি বলেন,

"যে ধর্ম আমাদের মুক্তি দিতে আসে সেই হয়ে ওঠে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচণ্ড শত্রু। সব বাঁধনের মধ্যে ধর্মনামাঙ্কিত বাঁধন ভাঙাই সব চেয়ে কঠিন। সব গারদের চেয়ে জঘন্যতম সেটা যা অদৃশ্য, যেখানে মানুষের আত্মা মোহজনিত আত্মপ্রবঞ্চনায় বন্দী।" (ঐ, ২৫৮ পৃঃ)

অন্ধ সংস্কার প্রবণতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে কবির সংগ্রাম ক্রমেই ক্ষমাহীন হয়ে

উঠেছে। এক সময়ে তিনি নবীনের উপাসকদের মধ্যে নেতিবাচক ভাঙনের মনোভাবের সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তিনি দেখলেন যে প্রাচীনের জড়ত্ব সব দিকেই চলার পথে প্রকাণ্ড বাধা হয়ে আছে তখন তিনি বললেন যে, এমন স্থলে খাঁচাটাকেই ভাঙবার পরামর্শ দিতে হয়। তিনি বললেন "দেশের মধ্যে এক সময়ে চলার ঝোঁক এসেছিল, সেটা কেটে গিয়ে এখন বাঙালীর মনীষা আবার বাঁধিবোলের বেড়া বাঁধবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।" (রবীন্দ্র জীবনকথা, ১৩৬ পৃঃ) এই সময়ে 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' নামক প্রবন্ধে কবি লেখেন,

"যাহা-কিছু চলিতেছে তাহারই সঙ্গে জগতের চিরন্তন চলার যোগ আছে, যাহা থামিয়া বসিয়াছে তাহার সঙ্গে সনাতন প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ক্ষুদ্র ভারতের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গেছে ; তাহার মধ্যে সাহস নাই, সৃষ্টির কোনো উদ্যম নাই, এইজন্যই মহাভারতের সনাতন প্রাণের সঙ্গে তাহার যোগই নাই। যে যুগ দর্শন চিন্তা করিয়াছিল, যে যুগ শিল্প সৃষ্টি করিয়াছিল, যে যুগ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন। অথচ আমরা তারিখের হিসাব করিয়া বলিতেছি, জগতে আমাদের মতো সনাতন আর কিছুই নাই। কিন্তু তারিখ তো কেবল অঙ্কের হিসাব, তাহা তো প্রাণের হিসাব নয়। তাহা হইলে তো ভস্মও অঙ্ক গণনা করিয়া বলিতে পারে, সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন অগ্নি।

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস। শক্তি কোথাও বাধা মানিতে চায় নাই বলিয়া মানুষ সমুদ্র পর্বত লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছে ; বুদ্ধি আপাতপ্রতীয়মানকে ছাড়াইয়া, অন্ধসংস্কারের মোহজালকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া, মহৎ হইতে মহীয়ানে, অণু হইতে অণীয়ানে, দূর হইতে দূরান্তরে, নিকট হইতে নিকটতমে সগৌরবে বিহার করিতেছে। ব্যাধি দৈন্য অভাব অবজ্ঞা কিছুকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহার্য মনে করিয়া হালছাড়িয়া বসিয়া নাই, কেবলই পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে। যাহাদের সে দুঃসাহস নাই তাহারা আজও মধ্য আফ্রিকার অরণ্যতলে মূঢ়তার স্বকপোল কল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগ-যুগান্তর গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

* * * *

এই দুঃসাহসিকের দল নিজের সমাজের মধ্যেও যে লক্ষ্মীছেলে হইয়া ঠাণ্ডা

হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে। যাহা আছে তাহাই যে চূড়ান্ত, একথা কোনোমতেই তাহাদের মন মানিতে চায় না। বিজ্ঞ মানুষদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ বেড়া ভাঙিয়া, পুরাতন বেড়া সরাইয়া, কত উৎপাত করিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রাণের চাঞ্চল্য তাহাদের স্বভাবতই প্রবল বলিয়াই, সেই বিপুল বেগেতেই তাহারা সমস্ত সীমাকে কেবলই ধাক্কা মারিয়া বেড়ায়। ইহা তাহাদের স্বভাব। এমনি করিয়াই আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে, যেখানে সীমা দেখা যাইতেছিল বস্তুতই সেখানে সীমা নাই। ইহারা দুঃখপায়, দুঃখ দেয়, মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্তু বাঁচিবার পথ ইহারাই বাহির করিয়া দেয়।

আমাদের দেশে সেই জন্ম লক্ষ্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। কারণ, তাহারাই যে প্রাণের স্বাভাবিক সৃষ্টি, প্রাণ যে আপন গরজেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে যে-কোনো শক্তিই—মানুষকে সম্পূর্ণ আপনার তাবেদার করিতে চায় সে প্রাণের লীলাকেই সব চেয়ে ভয় করে—সেই কারণেই আমাদের সমাজ ঐসকল প্রাণবহুল দুরন্ত ছেলেকে শিশুকাল হইতে নানাপ্রকার শাসনে এমনিই ঠাণ্ডা করিতে চায় যাহাতে তাহাদের ভালোমানুষি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়।" (রচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড , ২২০-২২১ পৃঃ)

উপরোক্ত বক্তব্যকেই তিনি ছন্দে রূপায়িত বরেছে 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থের 'সবুজের অভিযান, নামক কবিতায়।

"ওরে নবীন, ওরে আমরা কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে,
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে।
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা
আয় দুরন্ত, আয়রে আমায় কাঁচা।

* * *

শিকলদেবীর ওইযে পূজাবেদি
চিরকাল কি রইবে খাড়া?

পাগলামি, তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মতন বিজয় কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

এই ধারাই এগিয়ে চলেছে তাঁর পরবর্তী বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

ভারতের প্রাচীন চিন্তাসম্পদের প্রতি অনুরাগ থেকে এক সময়ে তাঁর মনে যে অতীতমুখীনতার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্তা-ধারার সংস্পর্শে এসে সে ঝোঁক সম্পূর্ণ কেটে যায়। দ্বিতীয় বার ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণের ফলে নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি সেই পিছুটানকে অতি-ক্রম করেন। এই সম্বন্ধে কবি-জীবনীকার বলেছেন,

" 'প্রাচীন ভারতের অবাস্তবতা থেকে কবির মন ক্রমশই মুক্তি পেয়ে আধুনিক হয়ে উঠছে; য়ুরোপ ও আমেরিকা-ভ্রমনের এটাই হল প্রত্যক্ষ ফল। ভারতীয়রা যে পাশ্চাত্য জাতির সমতুল্য নয়, এইটা পদে পদে অনুভব করছেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে শক্তিতে তাদের সমতুল্য হতে না পারলে বিশ্বদরবারে সম্মানের আসন সে পাবে না, এই ভাব থেকেই কবি আজ শিক্ষা সমস্যাকে দেখছেন এবং শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলতে হবে ভাবছেন।" (রবীন্দ্রজীবন কথা, ১৩০ পৃঃ)

কবির জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি অন্ধ অতীতমুখীনতার বিরুদ্ধে লেখেন,

"সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে। আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবান দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার ধূলি-পুঞ্জে শুষ্ক পত্রে সে আজিকাব নূতন যুগের প্রভাত সূর্যকে ম্লান করিল, নব-নব অধ্যবসায়-শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল—আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে, তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব—সেই মনুষ্যত্ব যে চিরজয়ী যে চিরজাগরূক চিরসন্ধানবত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণহস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগ-যুগের নব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশে দেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।" ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ)

কিন্তু পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার প্রভাব তাঁকে উপনিষদীয় ঐক্যতত্ত্বের ইতিবাচক দিকটিকে উপেক্ষা করতে শেখায় নি বরং তিনি সেই তত্ত্বকে একটি সুষ্ঠু বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টির আলোকে উপস্থাপিত করেছেন।

"অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁহার বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে বিধান শাশ্বতকালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্য-কালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্য-বিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এত বড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে সে বলিতেছে, 'ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিকিতে দিব না; জ্ঞানের অভাব, অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই; মানুষের ঘরে যে কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে—সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এতবড়ো সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কী পরমাশ্চর্য ব্যাপার, তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা একই। এখানেও দেখা যায়, অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।" (ঐ, ২৩৬-২৩৮ পৃঃ)

উপনিষদীয় চিন্তায় তিনি যে মোহমুক্ত জ্ঞানের প্রেরণা পেয়েছিলেন তা

পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী চিন্তার সংস্পর্শে আরো সমৃদ্ধ এবং তীক্ষ্ণ হয়েছে। তাঁর ধারণায় পূর্বে যে বিমূর্ত ভাবছিল তা অনেক পরিমানে কেটে গেছে এবং স্বদেশবাসীর মোহান্ধকার অপনোদনের জন্য তিনি অধিকতর দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়েছেন।

"আমাদের ঘরগড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ, সমৃদ্ধি লাভ, দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভ এই নিশ্চিত বোধটাই বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত। ব্যক্তিবিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তিব ক্ষেত্রে য়ুরোপের এত বড়ো মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উলটাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সেই কর্তাটিকে—ঘরের বাপ দাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডাপুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজি পাঠক বলিবেন, 'আমরা তো এসব মানি না। আমরা তো বসন্তের টিকা লই; ওলাউঠা হইলে নুনের জলের পিচকিরি লইবার আয়োজন করি; এমন কি মশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজও আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি—' এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটিকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোন্‌টাকে মানি বা নাই মানি তাহাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ওই মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানিনা বলিয়াই হাজার রকমের ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগে ভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি।" (ঐ, ২৩৫ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্মবাদ এবং বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চেয়েছেন। সে চেষ্টা নিম্নোদ্ধৃত ছত্রগুলির মধ্যে রূপ পেয়েছে,—

"বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বের

নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর কেউ না, আর কিছুতে না। * * * এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্য পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচলধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত; কেবলই এ-ভয়ে সে-ভয়ে পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত, কিন্তু তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে দলিল সে হচ্ছে বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল: তারই মহা আশ্বাস বাণী হচ্ছে: যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাঃ। তিনি অনন্ত কাল অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন; 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম; একদিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর একদিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুইয়ের যোগে তুমি বড়ো হও, জয় হোক্ তোমার; এরাজ্য তোমারই হোক্, এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।" ('শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৬৬৭ পৃঃ)

এই সমন্বয়ে অবশ্য শেষ পর্যন্ত অধ্যাত্মবাদেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু কবির সেই অধ্যাত্মবোধের চরিত্র ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বস্তুর ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা না করলে মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারে না। মহান আদর্শের জন্য যে ত্যাগ ও দুঃখবরণ করা প্রয়োজন তার প্রেরণা আসে ভূমার অনুভূতি থেকে। সে প্রেরণা মানুষের অন্তর্নিহিত। তবে সে প্রেরণা যে মানুষকে বাস্তবকে উপেক্ষা করতে শেখায় না, এই কথাটি কবি ঐ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধেই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

"বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মে এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। ... এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর

পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে—বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।" (ঐ, ৬৬৫ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা পশ্চিমের বিজ্ঞান সাধনাকে বস্তুবাদী বলে উপেক্ষা বা তার বিরোধিতা করার বদলে স্বদেশবাসীকে সেই সাধনায় আত্মনিয়োগের জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছে। তিনি বলেছেন যে মানুষের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। সে বিদ্রোহী, তাই সে জীবের ইতিহাসে এত বড় গৌরবের আসন দখল করেছে।

"আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তাহলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটছে এ-সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে, অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা সুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছেঃ মানব না, মানাব। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধিলাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও এতটুকু ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্ব ব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন ঝোঁকে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে, তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।

* * * *

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার

যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তি-রূপকে যা সূর্য নক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাটিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যকরূপে জীবন রক্ষা হয়, জীবন পোষণ হয়, জীবনের সকল প্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা; এ যখন আমার বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।" (ঐ, ৬৬৫-৬৬৭ পৃ:)।

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ যেমন একদিকে গান ও কবিতার মাধ্যমে প্রেরণা যুগিয়েছেন, তেমনি সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন উদার যুক্তিনিষ্ঠ দেশপ্রেমের আদর্শ। বঞ্চিত উপেক্ষিত জন-সাধারণই যে দেশের প্রাণশক্তি সে কথা তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন এবং স্বদেশবাসীর হাতে সেই জনগণের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ভাবাবেগসর্বস্ববিমূর্ত দেশপ্রেমের দুর্বলতা সমালোচনা করে তিনি সেদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই সময়ে তিনি লেখেন, "আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া 'মা' শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে 'মা'কে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি, কেবল গানের দ্বারা, কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মা'কে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভাণ, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মা'কে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনো মতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাষ্টার পড়া বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে

না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন, এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়েছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়াই রাগ করি।

অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরাজিপড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে না বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই; আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়. ধোবা-নাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়। কাজ ফাঁকি দিবার জন্য, পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্যধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়, অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে—অথবা চালনার চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।" ('আত্মশক্তি ও সমূহ শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত 'সদুপায়' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, দ্বাদশখণ্ড, ৮২৯-৮৩০ পৃঃ)

হিন্দু-মুসলমান মিলনের সমস্যা সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রয়োগ করে বলেন,

"ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন

দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমন তবো ঘটেনা। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানেনা, এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।" (ঐ)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিতে শুধুমাত্র তত্ত্বের ক্ষেত্রে সীমিত রাখেন নি। তার মর্মবাণীকে সমসাময়িক জাতীয় পরিস্থিতিতে প্রয়োগে উদ্যোগী হয়েছেন। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনেব অঙ্গ হিসাবে যে রাখীবন্ধন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল তাকে তিনি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রসারিত করতে চেয়েছেন। তখন একটি চিঠিতে তিনি লেখেন যে রাখীবন্ধনের তাৎপর্যকে বাংলাদেশেব একটা সাময়িক ঘটনার সঙ্গে আবদ্ধ রাখলে আব চলবে না। "এই ক্ষেত্রকে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাতরূপে পরিণত করতে হবে। তাহলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তাহলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদের মিলন হবে।" (রবীন্দ্রজীবনকথা, ১১৫-১১৬ পৃঃ)

তখনও বাংলার সমস্যা সর্বভারতীয় সমস্যা হয়ে ওঠে নি। কবির মনে নিখিল ভারতের চিত্ত-উদ্বোধন, সর্বভারতীয় সংযোগ এবং সর্বধর্মের মিলনের প্রশ্ন বড় হয়ে উঠছে। তাই তিনি নূতন সাধনাগ্রহণের প্রস্তাব করেন যে, আমরা ভারতীয়। এর কয়েক বছর পরে তিনি 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে বলেন যে ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত বাণী হল সর্বমানবের মিলনের বাণী। ঐ প্রবন্ধে তিনি ভারত-ইতিহাসের সম্বন্ধে এক নূতন দৃষ্টিকোণ দিয়ে আলোচনা এবং নানা উদাহরণের সাহায্যে দেখানর চেষ্টা করেন যে, ভেদবুদ্ধি ঘোচানই ছিল ভারতের সাধনা। তিনি লেখেন, "আজ আমরা যে-কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না; তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের উপরে বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে,—তাই আজ এই স্থির জলে আবার

যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার ভাঁটার আনাগোণা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্‌যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজত্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজত্বই হারানো হয় সর্বত্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্যপথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,—এই কথা নিশ্চিত রূপে বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত কবিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।" (রচনবলী; ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৬৪-১৬৫ পৃঃ)

কবি এখন ধর্মবোধ বলতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার যোগ চিত্তের যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। কবি-জীবনীকার বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ তখন কবীর এবং মধ্যযুগের সন্তদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং সকল ধর্মের ভাবুক-দের কথা জানার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

পাশ্চাত্যের যুক্তিধর্মী মানবতাবাদী চিন্তার সাথে পরিচয় কবির এই বিশ্বদৃষ্টিকে আরো সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী করেছে, তাঁর সামনে পরিপ্রেক্ষিত উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে। নিজ দেশের মানুষের সামনে তিনি সেই পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত করে বলেছেন,

"য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্রে কেবল জ্ঞানে নহে, ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে-কোনো খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে শক্তি, যে মুক্তি দিতেছে, সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার; তাহা সকল মানুষকে আশাদেয়, সাহস দেয়—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।" ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম,' রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৩৭ পৃঃ)

অন্যত্র তিনি পাশ্চাতের ঐ চিন্তাধারার অবদান সম্পর্কে বলেছেন,

"যখন প্রথম ইংরাজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তখন শুধু যে তার থেকে আমরা অভিনব রস আহরণ করেছিলাম তা নয়, আমরা পেয়েছিলাম মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করবার আগ্রহ; শুনতে পেয়েছিলেম রাষ্ট্রনীতিতে মানুষের শৃঙ্খলমোচনের ঘোষণা; দেখেছিলেম বাণিজ্যে মানুষকে পণ্যে পরিণত করার বিরুদ্ধে প্রয়াস। স্বীকার করতেই হবে, আমাদের কাছে এই মনোভাবটা নূতন। তৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে, জন্মগত নিত্যবিধানে বা পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের খর্বতা, আপন অসম্মান শিরোধার্য করে নিতে বাধ্য; তার হীনতার লাঞ্ছনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্ম পরিবর্তনে। আজও আমাদের দেশে শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হযে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; একথা ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবলশক্তি। য়ুরোপের সংস্রব একদিকে আমাদের সামনে এনেছে বিশ্বপ্রকৃতিতে কাযকারণবিধিব সার্বভৌমিকতা; আর-এক দিকে ন্যায়-অন্যায়ের সেই বিশুদ্ধ আদর্শ যা কোনো শাস্ত্রবাক্যেব নির্দেশে, কোনো চিরপ্রচলিত প্রথার সীমাবেষ্টনে, কোনো বিশেষ শ্রেণীর বিশেষ বিধিতে খণ্ডিত হতে পারে না।" ('কালান্তব' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড, ২১২ পৃঃ)

এই দৃষ্টির প্রদীপ্ত আলোকেই তিনি স্বদেশবাসীকে আহবান কবে বলেছিলন,

"আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবলপক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরাজের নিকট হইতে সদ্ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিতে পারিবনা; ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরাজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না; এবং ভারতবর্ষ কেবলি বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে।" ('সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধমালার অন্তর্গত 'পূর্ব ও পশ্চিম' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৬০ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তা বলতে কি বুঝেছিলেন সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইউরোপ ভ্রমণের পর তিনি উগ্রজাতীয়তা বোধের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং তার মানবতা-বিরোধী হিংস্র শোষণ-লোলুপ চরিত্রকে অনাবৃত করে ধরেন। সাম্রাজ্যবাদকে তিনি কখনই ক্ষমা করেন নি। নিজ দেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে তিনি যেমন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তেমনি অন্য দেশের উপরে আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। কবি-জীবনীকার লিখেছেন,

"দেশের সমস্যা নিয়ে মন যেমন ক্ষুব্ধ বিদেশে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার অবিচারের কথা পড়ে মন তেমনি ব্যথিত। কোথায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জুলুদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের অত্যাচারের সংবাদ, মাটাবিলি উপজাতির রাজা লবেঙ্গুলোর অসহায়ভাবে রাজ্য ত্যাগ করে পলায়ন-কাহিনী তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করে।" (রবীন্দ্র জীবন কথা, ৬১ পৃঃ)

তার অভিব্যক্তি স্বরূপ তিনি লেখেন,

"ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগতজনে! কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধকারা মাঝে
অনাথিনী মাগিছে সহায়।"

সাম্রাজ্যবাদের মুখোস উন্মোচন করে তিনি লেখেন,

"পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্যলোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পারিয়ালিজম্ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে।" ('শিক্ষার মিলন, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৬৭৪ পৃঃ)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের শান্তির বুলির আসল রূপটিকে অনাবৃত করে তুলে ধরে লেখেন,

"শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্য যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মত কিলবিল করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীর সর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর এই ক্ষীর সরের বড়ো বড়ো ভাণ্ডগুলো প্রায় আছে দুর্বলের জিম্মায়। এইজন্য যে ত্যাগশীলতায় সত্যকার শান্তি আছে সেই ত্যাগের ইচ্ছা প্রবলদের মনে কিছুতেই সহজ হতে পারছে না।" ('বাতায়নিকের পত্র', রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৮০ পৃঃ)

পাশ্চাত্যের উদার মানবতাবাদী চিন্তাকে অভিনন্দন জানালেও সেখানকার সামাজিক দ্বন্দ্ব ও মানুষের প্রতি অবিচার তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। উপরোক্ত 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধেই তিনি লিখেছিলেন,

"তেমনি ফল লাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন সমাজের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষ-গুলো হয় রথের বাহন। গড় গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তাহোক্, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই। কেন না কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিম দেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে একথা সুস্পষ্ট।" (রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৬৭২ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিজমের চরিত্র সম্বন্ধে প্রথমে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ তাঁকে ফ্যাসিজমের উপরের চেহারা দেখে আসল রূপটি নির্ণয় করতে সাহায্য করে নি। কবিজীবনীকার বলেছেন,

"মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তা থেকে এবং রোমের নানাস্থান দেখে ফ্যাসিষ্ট মতবাদের যে রূপটা কবির নিকটে প্রকাশ পেল তার মধ্যে এমন-কিছু নিন্দনীয় দেখতে পেলেন না। কর্মক্ষেত্রে কল্যাণেচ্ছু স্বেচ্ছাচার আর দলাদলির নাগরদোলায় ঘূর্ণ্যমান লোকতন্ত্র—উভয়ের মধ্যে কোনটা যে ভালো ও কাম্য সে বিষয়ে কবি মনস্থির করতে পারেন নি।" (রবীন্দ্রজীবন কথা, ১৯৯ পৃঃ)

অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর পক্ষে কিছু অসুবিধাও ছিল। সেকথাও কবিজীবনীকার লিপিবদ্ধ করেছেন।

"তবুও ভাসা-ভাসাভাবে রোমে যা দেখলেন বা ফর্মিকি সাহেব তাঁকে যা

বোঝালেন তার থেকে এইটুকু সাব্যস্ত হল যে, স্বভাবশিথিল ইটালীয়দের উপর শাসন জবরদস্তির সঙ্গে চলছে; তাতে তারা সুখী কি অসুখী তা বোঝবার উপায় নেই, কারণ দেশের সাময়িক পত্রিকাগুলি ফ্যাসিস্তদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে এটাও দেখলেন যে' দেশের জলুস অনেক বেড়েছে—তৎপরতাও। সাংবাদিকদের কাছে দুই-একটা কথা অস্পষ্টভাবে বললেন,—সেটাই সরকারি আধা-সরকারি কাগজে ফলাও করে, রঙ চড়িয়ে, ভারতীয় কবির মুসোলিনী-প্রশস্তিরূপে প্রচারিত হল। ইটালীয় ভাষায় কাগজপত্রে কী যে বের হচ্ছে তা ভালো করে জানার উপায় নেই, সঙ্গীদের মধ্যেও কেউ সে ভাষা জানেন না।" (ঐ, ১৯৯ পৃঃ)

কিন্তু রোমঁ্যা রোলঁার সঙ্গে সাক্ষাত ও আলোচনার ফলে যে মুহূর্তে তিনি তিনি ফ্যাসিজমের মানবতাবিরোধী রূপটি সম্বন্ধে অবহিত হলেন তখনই প্রকাশ্যে সে কথা ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি। তারপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধাচরণে অবিচল থেকেছেন। চীনের উপর জাপানের বর্বর আক্রমণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে জাপানী কবি নোগুচির চিঠির জবাবে লেখেন,

"আমি জাপানীদের ভালবাসি, তাদের জয়কামনা করতে পারি না, অনু-শোচনার ভিতর দিয়ে তাদের 'প্রায়শ্চিত্ত' হোক (wishing your people whom I love, not success but remorse)।" (রবীন্দ্রজীবনকথা, ২৬৩ পৃঃ)

ফ্যাসিজম্‌এর বিরুদ্ধে তাঁর ঐকান্তিক ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে 'কালান্তর' প্রভৃতি প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন,

"যে য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজম্‌এর নির্বিচার নিদারুণতা। একদিন জেনেছিলুম আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা য়ুরোপের একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আজ দেখছি য়ুরোপে এবং আমেরিকায় সেই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ প্রতিদিন প্রবল হয়ে উঠছে।" (রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২১৫ পৃঃ) ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃপ্ত আহ্বান জানিয়েই তিনি রচনা করেছিলেন সেই অবিস্মরণীয় ছত্রগুলি—

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।
যাবার আগে তাই—

ডাক দিয়ে যাই—
দানবের সাথে সংগ্রামের তরে
যারা প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।”

এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ নিজের বিভ্রান্তি, পিছুটান এবং সাময়িক দুর্বলতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছেন অব্যাহত গতিতে। সাধারণত দেখা যায় মানুষ বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মনের দিক দিয়ে স্থবির এবং রক্ষণশীল হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখা যায় এর বিপরীত প্রক্রিয়া। যত তাঁর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়েছে ততই তিনি অগ্রসর হয়ে চলেছেন। জীবনের সায়াহ্নে পৌছেও সত্যনিষ্ঠা তাঁকে আজীবনের বদ্ধমূল ধারণাকে বর্জন কবতে প্রেরণা দিয়েছে, এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে।

জনসাধারণ এবং গণসংগ্রাম সম্বন্ধে এবং সামাজিক পরিবর্তনেব ব্যাপারে কবির মতামতের বিকাশেব প্রক্রিয়া আলোচনা কবলে আমবা ঐ জিনিষটিই দেখতে পাই।

কবির মনে যখন মানবপ্রেমের উদ্ভব হয় তা বহুদিন পযন্ত বিমূর্তরূপেই ছিল, কাবণ তখন পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের ক্ষেত্র ছিল খুব সংকীর্ণ। নিজেও সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। সাতাশ বৎসর বয়সে তিনি নিজের জীবনে শস্যের সম্ভাবনা নেই বলে আফশোষ করেছিলেন। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সে জমিদারী দেখাশুনা উপলক্ষে তাঁর বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যাওয়া আসা সুরু হল। সেই সময়ে শুধু পল্লীপ্রকৃতির সাথেই নয়, পল্লীগ্রামেব সমস্ত রকম মানুষের সাথে মেলার সুযোগ হয়েছে। তিনি যাদের দেখেছেন এবং যাদের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের বোঝার চেষ্টা করেছেন, তাদের সুখদুঃখের কথা শুনেছেন এবং সন্ধানী মন নিয়ে মানবচরিত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা অমর হয়ে আছে ছোট গল্পগুলিতে। সাধারণ মানুষ নিয়ে গল্প রচনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। কবি সে সব মানুষকে রোম্যান্টিকতার রঙীন চশমা দিয়ে দেখেন নি, দেখেছেন সাদা চোখে। গল্পগুলিতে যেসব মানুষের দেখা পাওয়া যায় তার মধ্যে ভাল মন্দ দুইই আছে, ভালমন্দে মিশানো মানুষ আছে। গল্পে যেমন মানুষের ভিতরের নীচ পাশব প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ মেলে তেমনি নামগোত্রহীন অতি নগণ্য মানুষের ভিতরে মানবতার মহিমার প্রকাশ দেখা যায়। সমাজের অনাচার অবিচারের চিত্র পাওয়া যায় আবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব ঈঙ্গিত দেখতে পাই। আর সব মিলিয়ে সব

কিছু ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদ। ছোট গল্পেরই পাশাপাশি 'চৈতালি' কাব্যগুচ্ছে ধ্বনিত হয়েছে সাধারণ মানুষের জয়গানের প্রথম কাকলি।

সাধারণ মানুষ বা কবি যাদের বলেছেন 'লোকসাধারণ' তাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা অনুকম্পা নয়। তাদের সৃষ্টিক্ষমতার উপরে তিনি যে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন তা বহুবার বহুভাবে প্রকাশ পেয়েছে। লোকসাহিত্যের সম্পদের প্রতি দেশবাসীর, বিশেষত ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তিনিই প্রথম আকর্ষণ করেন। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে মাতব্বরীর মনোভাব ত্যাগ করে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"চিরদিনই লোকসাহিত্য লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। দয়ালু-বাবুদের উপর বরাত দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতলার ঘরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সকল সাহিত্যেরই যেমন এই লোকসাহিত্যেরও সেই দশা, অর্থাৎ ইহাতে ভালোমন্দ মাঝারি সকল জাতেরই জিনিষ আছে। ইহার যাহা ভালো তাহা অপরূপ ভালো—জগতের রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লজ্জা পাইবার কারণ নাই। অতএব, দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজের কোনো ডিগ্রিধারীকেই লোকসাহিত্যের মুরুব্বিয়ানা করা সাজিবে না। স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন না, তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন।" ('লোকহিত' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২২৬-২২৭ পৃঃ)

উপেক্ষিত অজ্ঞাত ব্রাত্য জনগণের ধর্মের আদর্শের মধ্যে যে উদার মানবতাবাদী ভাবধারা রয়েছে তার দার্শনিক ব্যাখ্যা করে ১৯২৫ সালে প্রথম ভারতীয় দর্শন সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দেন তার নাম "Philosophy of our People"। 'মানুষের ধর্ম' বইতেও তাদের কথাকে তিনি বড় স্থান দিয়েছেন। যুগে যুগে লোকসাহিত্যে সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে লোকসাধারণের সংগ্রামের যে প্রতিফলন হয়েছে তার রূপটিকে অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে। জনসাধারণের এই সংগ্রামী চেতনার প্রতি কবির শ্রদ্ধা মূর্তিমান হয়ে উঠেছে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রে। প্রথমে 'প্রায়শ্চিত্ত' পরে 'পরিত্রাণ' নামক নাটকে ঐ চরিত্রের দেখা পাই। 'মুক্তধারা' নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগী জনগণের প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন জানানর বদলে জনচিত্তকে জাগ্রত এবং জনশক্তিকে সংগঠিত করার উপরই বিশেষ জোর দিতেন। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা যখন জনচিত্তের জাগরণের বদলে জনসাধারণের মনের কুসংস্কারগুলিকে প্রশ্রয় দিতেন বা সেগুলিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন তখন রবীন্দ্রনাথ তার তীব্র সমালোচনা করতে কুন্ঠিত হন নি। মহাত্মা গান্ধী যখন এক বৎসরে স্বরাজ লাভের আশা দিয়েছিলেন তখন তার সমালোচনা করে কবি লেখেন,

"অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগছে। এ যেন সন্ন্যাসীর মন্ত্রশক্তিতে সোনা ফলাবার আশ্বাস। এই আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজের বিচারবুদ্ধি অনায়াসে জলাঞ্জলি দিতে পারে এবং অন্য যারা জলাঞ্জলি দিতে রাজি হয় না তাদের 'পরে বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বাহিরের স্বাতন্ত্র্যের নামে মানুষের অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে এই রকমে বিলুপ্ত করা সহজ হয়। সকলের চেয়ে আক্ষেপের বিষয় এই যে, সকলেই যে এই আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তা নয় কিন্তু তারা বলে, এই প্রলোভনে দেশের একদল লোককে দিয়ে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

*　　*　　*　　*

এমনভাবে লোকের মনকে মোহাবিষ্ট করে তারপরে যখন তাকে বলা হয়, 'তোমার বুদ্ধি-বিদ্যা প্রশ্নবিচার সমস্ত দাও ছাই করে, কেবল থাক্ তোমার বাধ্যতা' তখন সে রাজি হতে বিলম্ব করে না। কিন্তু কোনো-একটা বাহ্যানুষ্ঠানের দ্বারা অদূরবর্তী কোনো একটা বিশেষ মাসের বিশেষ তারিখে স্বরাজ লাভ হবে, একথা যখন অতি সহজেই দেশের অধিকাংশ লোক বিনা তর্কে স্বীকার করে নিলে এবং গদা হাতে সকল তর্ক নিরস্ত করতে প্রবৃত্ত হল, অর্থাৎ নিজের বুদ্ধির স্বাধীনতা বিসর্জন দিলে এবং অন্যের বুদ্ধির স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হল, তখন সেটাই কি একটা বিষম ভাবনার কথা হল না? এই ভূতকেই ঝাড়াবার জন্যে কি আমরা ওঝার খোঁজ করি নে? কিন্তু, স্বয়ং ভূতই যদি ওঝা হয়ে দেখা দেয় তা হলেই তো বিপদের সীমা রইল না।" (সত্যের আহ্বান, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৯৭ পৃঃ)

মহাত্মা গান্ধী দেশপ্রেমের আহ্বানকে জনসাধারণের হৃদয়দ্বারে পৌঁছে

দিয়েছেন বলে কবি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু মহাত্মাজি যখন চরকাকেই স্বরাজ সাধনার একমাত্র উপায় রূপে নির্দেশ দিয়েছেন তখন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেন না তাঁর মধ্যে সত্য আছে; অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটি মাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, 'কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো'। এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'? এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?" (ঐ, ৩০১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে "আমাদের দেশের স্বরাজের ভিত-পত্তন করতে হলে দৈববাণীর আসনে বিশেষ করে বুদ্ধির বাণীকে পাকা করে বসাতে হবে। কেন না, আমার পূবের প্রবন্ধে বলেছি, দৈব স্বয়ং আধিভৌতিক রাজ্যে বুদ্ধির রাজ্যাভিষেক করেছেন। তাই আজ বাইরের বিশ্বে তারাই স্বরাজ পাবে এবং তারাই তাকে রক্ষা করতে পারবে যারা আত্মবুদ্ধির জোরে আত্মকর্তৃত্বের গৌরব উপলব্ধি করতে পারে, যারা সেই গৌরবকে কোনো লোভে কোনো মোহে পরের পদানত করতে চায় না।" (ঐ, ৩০২ পৃঃ)

বাংলার মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধেও তিনি ঐ যুক্তিবাদী দৃষ্টির আলোকে পর্যালোচনা করেছেন। তাদের অকৃত্রিম দেশভক্তি এবং আত্মত্যাগকে প্রশংসা করেছেন আবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের পথ যে নিস্ফল সেকথা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। "বড়ো আশা করিয়াছিলাম, দেশে যখন দেশভক্তির আলোক জ্বলিয়া উঠিল তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে মহৎ তাহাই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে; আমাদের যাহা যুগ সঞ্চিত অপরাধ তাহা আপন অন্ধকার, কোণ ছাড়িয়া পালাইয়া যাইবে, দুঃসহ নৈরাশ্যের পাষাণস্তর বিদীর্ণ করিয়া অক্ষয় আশার উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিবে এবং দুরূহ নিরুপায়তাকেও উপেক্ষা করিয়া অপরাহত ধৈর্য এক এক পা করিয়া আপনার রাজপথ নির্মাণ করিবে; নিষ্ঠুর অত্যাচারের ভারে এদেশে মানুষকে মানুষ যে অবনত অপমানিত করিয়া রাখিয়াছে, অকৃত্রিম প্রীতির আনন্দময় শক্তির দ্বারা সেই ভারকে দূর করিয়া সমস্ত দেশের লোক এক সঙ্গে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু আমাদের

ভাগ্যে এ-কী হইল? দেশভক্তির আলোক জ্বলিল,, কিন্তু সেই আলোতে এ কোন্ দৃশ্য দেখা যায়—এই চুরি, ডাকাতি, গুপ্তহত্যা? দেবতা যখন প্রকাশিত হইয়াছেন তখন পাপের অর্ঘ্য লইয়া তাঁহার পূজা? যে দৈন্য যে জড়তায় এতকাল আমরা পোলিটিকাল ভিক্ষাবৃত্তিকেই সম্পদলাভের সদুপায় বলিয়া কেবল রাজদরবারে দরখাস্ত লিখিয়া হাত পাকাইয়া আসিয়াছি, দেশপ্রীতির নব-বসন্তেও সেই দৈন্য, সেই জড়তা, সেই আত্ম-অবিশ্বাস—পোলিটিকাল চৌর্যবৃত্তিকেই রাতারাতি ধনী হইবার একমাত্র পথ মনে করিয়া সমস্ত দেশকে কি কলঙ্কিত করিতেছে না?

*　　*　　*　　*

কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলাদেশে কেবল যে চোর-ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দৈবীশক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনো দিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয়বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্ণমেণ্টের চাকরি বা রাজ-সম্মানের আশা নাই তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কণ্টকিত। আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে।" ('ছোটো ও বড়ো' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২৫৮-২৫৯ পৃঃ)

দেশের জনচিত্তের জাগরণের জন্য তিনি একটি বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত করেছিলেন। স্বাধীন বুদ্ধির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ঐক্যকে বিশ্বমানবতার ঐক্যের পটভূমিতে দেখার জন্য ডাক দিয়ে তিনি বলেছিলেন,

"একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই—ভারতের আজকের এই উদ্‌বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্‌বোধনের অঙ্গ। * * * * এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্য যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া। চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা

করাই—বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা।" ('সত্যের আহ্বান,' রচনাবলী, ঐ, ৩০৪ পৃঃ)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে একটা দুর্বলতা ছিল। গণসংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর মনে ছিল একটা বড়রকমের ভীতি। গণজাগরণের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের চেয়ে চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হতে তাঁর আপত্তি ছিল। তাই মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সুরু করেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি খোলা চিঠিতে জানালেন যে "লোকের মনকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত না করে, এ-ভাবে অহিংস প্রতিরোধের আন্দোলন চলতে পারবে না—পদে পদে অনর্থের ও সমস্যার সৃষ্টি হবে।" (রবীন্দ্র জীবন কথা, ১৬২ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী জাগ্রত গণমনের প্রতীক বটে কিন্তু তার চরিত্রে কবির তৎকালীন জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর বিশ্বাস অত্যাচারীর ভিতরের শুভবুদ্ধি একদিন জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং তাহলেই অত্যাচারের অবসান হবে। 'মুক্তধারা' নাটকের মর্মবাণী সম্বন্ধে কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

"যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে; কেন না যে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে। আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে—সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ। নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর, ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, আমি মারের উপরে, মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব। যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই—আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ-দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে, মার লাগিয়ে জয়ী হব। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, হে, মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও। আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে।

যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।" (শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে ২১শে বৈশাখ, ১৩২৯ তারিখে লিখিত চিঠি। বিশ্বভারতী কর্তৃক মুক্তধারা নাটকের পরিশিষ্টে প্রকাশিত)।

গণসংগ্রাম সম্বন্ধে ভীতি ও বিরূপতা সত্ত্বেও যখন গণআন্দোলনের উপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিংস্র আক্রমন চালিয়েছে তার বিরুদ্ধে তিনি বারবারই দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর সেই নির্ভীক প্রতিবাদের অজস্র অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর শুধু বইয়ের পাতাতেই ছড়িয়ে নেই, বাঙালীর ধ্যানধারণার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

পরবর্তীকালে কবি উপরোক্ত জীবনদর্শনের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। ধনতান্ত্রিক শোষণের যে চেহারা তিনি দেখেছেন ইউরোপ ও আমেরিকায়, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের অমানুষিক বর্বরতার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার আলোকে তিনি পুরাতণ ধারণাকে কাটিয়ে উঠতে দ্বিধা করেন নি। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রয়েছে তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

"তাছাড়া আমার কানে সেই কোরীয় যুবকের কথাটা বাজছিল। মনে মনে ভাবছিলুম, ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পেতেছে সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটি কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, এটা দেখবার জন্যে আমি যাব না তো কে যাবে? ওরা শক্তিশালীর শক্তিকে ধনশালীর ধনকে বিপর্যস্ত করে দিতে চায়, তাতে আমরা ভয় করব কিসের, রাগই করব বা কেন? আমাদের শক্তিই বা কী, ধনই বা কত?

আমরা তো জগতের নিরন্ন নিঃসহায়দের দলের।

যদি কেউ বলে দুর্বলের শক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছে তাহলে আমরা কোন মুখে বলব যে, তোমাদের ছায়া মাড়াতে নেই? তারা হয়তো ভুল করতে পারে—তাদের প্রতিপক্ষেরাও যে ভুল করবে না তা নয়। কিন্তু আমাদের বলবার আজ সময় এসেছে যে, অশক্তের শক্তি এখনই যদি না জাগে তাহলে মানুষের পরিত্রাণ নেই। কারণ, শক্তিমানের শক্তিশেল অতিমাত্র প্রবল হয়ে উঠেছে; এতদিন ভূলোক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, আজ আকাশকে পর্যন্ত পাপে কলুষিত করে তুললে। নিরুপায় আজ অতিমাত্র নিরুপায়—সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আজ কেবল মানব

সমাজের একপাশে পুঞ্জীভূত, অন্য পাশে নিঃসহায়তা অন্তহীন।”

(রচনাবলী, দশম খণ্ড, ৬৮১ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই সাম্যবাদী মতবাদ গ্রহণ করেন নি, বা সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেদিকটি তাঁর চোখে নেতিবাচক, বলে ঠেকেছে তার সমালোচনায় কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু ‘রাশিয়ার চিঠিতে প্রকাশিত তাঁর মতামত যে ‘মুক্তধারা’য় রূপায়িত জীবনদর্শনের থেকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়েও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে তাঁব মতামতের বিকাশের উল্লেখ করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সমাজের নীচের তলার মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্বেও বিশ্বাস করতেন যে উচ্চনীচ শ্রেণীভেদের অস্তিত্ব অনিবার্য। তাই তিনি শ্রেণীভিত্তিক সমাজের কাঠামোর ভিতরেই জনসাধারণকে যতটা সম্ভব সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং বিকাশের সুযোগদানেব কথা ভাবতেন। শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে মনে করতেন অলীক কল্পনা বলে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠণের কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতায় তাঁর সেই বিশ্বাসের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। ‘রাশিয়ার চিঠি’র প্রথম চিঠিতেই তিনি সে কথা অকপটে ব্যক্ত করেন। “রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।” (ঐ, ৬৭৫ পৃঃ)

তিনি ঐ চিঠিতেই নিজের পূর্বেকার ধারণার কথা বর্ণনা করে লিখেছেন,

“চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে—জীবন-যাত্রার জন্য যত কিছু সুযোগ সুবিধে সব-কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

আমি অনেকদিন এদের কথা ভেবেছি, মনে হয়েছে এর কোনো উপায় নেই। এক দল তলায় না থাকলে আর এক দল উপরে থাকতে পারে

না, অথচ উপরে থাকার দরকার আছে। উপরে না থাকলে নিতান্ত কাছের সীমার বাইরে কিছু দেখা যায় না; কেবলমাত্র জীবিকানির্বাহ করার জন্যে তো মনুষ্যত্ব নয়। একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে। মানুষের সভ্যতায় এক অংশে অবকাশ রক্ষা করার দরকার আছে। তাই ভাবতুম, যে-সব মানুষ শুধু অবস্থার গতিকে নয়, শরীর-মনের গতিকে নিচের তলায় কাজ করতে বাধ্য এবং সেই কাজেরই যোগ্য, যথাসম্ভব তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সুখ সুবিধার জন্য চেষ্টা করা উচিত।" (ঐ)

* * *

এই অবস্থাকে অনিবার্য বলে মেনে নিতে তাঁর মন সায় দেয় নি কিন্তু অন্য কোন উপায়ও খুঁজে পান নি। সোভিয়েট রাশিয়ার অভিজ্ঞতায় তিনি লিখলেন

"রাশিয়ায় একেবারে গোড়া ঘেঁষে এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা চলছে। তার শেষ ফলের কথা এখনও বিচার করবার সময় হয় নি, কিন্তু আপাতত যা চোখে পড়ছে তা দেখে আশ্চর্য হচ্ছি।" (ঐ, ৬৭৬ পৃঃ)

'কালের যাত্রা' নাটকে তিনি পরিষ্কার ভাবেই ঘোষণা করেছেন যে আগামীকাল হল ঐ সমাজের নীচের তলার মানুষদের, ব্রাত্য-শূদ্রদের।

মন্ত্রী

"ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদেরই সঙ্গে সমান হয়ে।"

(বিশ্বভারতী প্রকাশিত ১৯৬০ সংস্করণ, ৩৯ পৃঃ)

সেই মানুষেরাও সমাজের রথ চালাতে ভুল করতে পারে। সে সম্ভাবনাকে কবি দেখেছেন কি ভাবে, তা মন্ত্রী ও শূদ্র দলপতির মধ্যে কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে।

মন্ত্রী

সৈনিকের প্রতি

চুপ করো!
সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,

তোমরা নারায়ণের গরুড় !
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয়রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।

মন্ত্রী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো।
বরাবর যে-রাস্তায় রথ চলেছে, যেয়ো সেই রাস্তা ধরে।
পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাইনি, তাই রাস্তা চিনি নে।
রথে আছেন যিনি তিনিই সামলাবেন।
আয় ভাই, দেখছিস রথচূড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে।
বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই।
ঐ চেয়ে দেখরে ভাই,
মরা নদীতে যেমন বান আসে
দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁছেচে।"

(ঐ, ৩৬-৩৭ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে শূদ্ররা যদি ভুল করেই তখন আবার হয়ত পরিবর্তন হবে, কিন্তু সেখানেও তিনি সেই নতুন যুগের নীচের তলার লোকদের দিকে তাকিয়েছেন। উক্ত নাটকে, কবি-চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন

"তার পরে কোন্ এক যুগে কোন্ একদিন
আসবে উল্‌টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এই বেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধূলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,

যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে

তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।" (ঐ, ৪৭ পৃঃ)

নূতন যুগের মানুষ ভুল করবে ভয়ে তিনি তাদের পিছিয়ে থাকতে বলেন নি বা নিজেও দূরে সরে থাকতে চান নি।

রবীন্দ্রনাথ যখন জীবন-সন্ধ্যায় লিখেছিলেন,

"আমার কবিতা, জানি আমি,

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

তখন কেউ কেউ বলেছিলেন যে তিনি এতদিন পরে জনসাধারণের সাথে সংযোগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি নিতান্তই অগভীর না হলে কেউ উক্তরূপ মন্তব্য করতে পারেন না। কবিগুরু দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। যখন বিদেশে গিয়েছেন তখনও সুযোগ পেলে শ্রমজীবি মানুষের সাথে মিশেছেন এবং সেই—অভিজ্ঞতাকে নিজ জীবনের অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য করেছেন। তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে 'রাশিয়ার চিঠি'র পাতায় পাতায়। আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন কবি-জীবনীকার। ঘটনাটি ১৯২১ সালের।

"একদিন ডার্মস্টাট শিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের আড্ডায় কবি গেলেন। শ্রমিকদের গ্রাহ্যই নেই ঘরে কে এল। বীয়ারের বোতল সামনে খোলা, চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার—তারই মধ্যে গিয়ে কবি বসলেন। ধীরে ধীরে দুই চারটি কথা আশে পাশে বলতেই, দেখা গেল লোকেদের মধ্যে একটু ভাবান্তর। মদের বোতল টেবিলের তলায় ঢোকালো, চুরুট নিবিয়ে পকেটে ভরলো, আসনের উপর ঘুরে বসল কবি কী বলছেন শোনবার জন্য। কবি পরে বলেছিলেন যে তাঁর জীবনে এত বড়ো বিজয় আর কখনো হয়নি।" (রবীন্দ্রজীবন কথা, ১৭৫ পৃঃ)

যে জীবন-বোধ কবিকে বিশ্বের সাথে ঐক্যের অনুভূতিতে পুলকিত করেছে সেই জীবনবোধই তাঁকে টেনে এনেছে মানুষের অধিকারের স্বপক্ষে সংগ্রামের প্রথম সারিতে। জীবনসায়াহ্নে পৌঁছে তিনি যেমন লিখেছেন

"এই বিশ্বসত্তার পরশ

স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ

তুলি লব অন্তরে অন্তরে—

সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা—
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালবাসা।'"

(জন্মদিন—পরিশেষ)

তেমনি লিখেছেন,

"কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাক,'
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরি।
শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাক'
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।
পাষাণ ভিত টলিছে যেথা, ক্ষিতির বুক ফাটি
ধূলায়-চাপা অনলশিখা কাঁপায়ে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি,
সেথায় ভেরি বাজাও বারে বারে।"

(আহ্বান—পরিশেষ)

তাঁর বিশ্বের সাথে ঐক্যবোধের মধ্যমণি যে ভেদবুদ্ধি ও সংস্কারের বন্ধনমুক্ত সর্বমানবে ঐক্যবোধ, তাকে ছন্দে রূপ দিয়ে বলেছেন।

"ওরা তুলে নিয়ে গেল ওদের দেবতার পূজায়
শাস্ত্র মিলিয়ে বাছা-বাছা ফুল,
রেখে দিয়ে গেল আমার দেবতার জন্যে

সকল দেশের ফুল,
এক সূর্যের আলোকে চিরস্বীকৃত।
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলনক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই,
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় করে—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল কালের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।
(পনেরো—পত্রপুট)

কবির আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ প্রথমে বিমূর্ত ছিল বটে কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট সংগ্রামী রূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি বলেছেন,

"যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশাণচারী ভৈরবের পরিচয় জ্যোতি
ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়,
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশ্যে,
মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি
মৃত্যুর মূল্যে, দুঃখের দীপ্তিতে।"
(বারো—পত্রপুট)

তাঁর মানবতাবাদ থেকে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি এবং সেজন্য অনেক সময় তাঁকে মন ও চিন্তার গভীর সঙ্কটে পতিত হতে হয়েছে, একথা সত্য। এমনি এক গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছে তাঁর মনে ফ্যাসিবাদের নিদারুণ বর্বরতার সম্মুখীন হয়ে। বিমূর্ত মানবতাবাদী দৃষ্টির সাহায্যে তিনি ফ্যাসিবাসের অভ্যুদয় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপদের প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণে সমর্থ হন নি। তাই দুঃখ করে ব'লেছেন,

"এমন সময়ে দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কীরকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি?" ('সভতার সঙ্কট' নামক প্রবন্ধ, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৪১০ পৃঃ)

আক্ষেপ করে বলেছেন,

"জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" (ঐ)

প্রশ্ন উঠেছিল তাঁর মনে, অন্তর আকুল-করা প্রশ্ন

"যুদ্ধপরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জ ভাবে চারিদিকে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকল তখন এই কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই কি চিরকাল

ঠেকাতে হবে বর্বরতা? ('কালান্তর' রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)

কিন্তু, সে সঙ্কটের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি, এটাই সব চেয়ে বড় কথা। তাঁর মানবতাবাদের অপরাজেয় প্রাণসত্তা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছে,

"যে দুঃখী, যে অপমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহ-গর্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেই দিনই বুঝব, এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কড়া পর্যন্ত দেউলে হল। তারপরে আসুক কল্পান্ত।" (ঐ)

যুগ দেউলে হবে না, মনুষ্যত্বের উপরে বিশ্বাস হারাতে হবে না, হারাব না—এই অপরাজিত মানবতাবাদেরই শেষ ঘোষণা রূপে তিনি বলে গেছেন,

"কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ-মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি পাপ বলে মনে করি।" (সভ্যতার সঙ্কট, রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৪১০ পৃঃ)

রবীন্দ্র-জীবনবেদের বিকাশের ধারাকে সত্যনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনার পর একটি সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয়। সে জীবনবেদে কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্যবাদের স্থান নেই। প্রথম দিকে তা যে রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকা ছিল ক্রমশ সে অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়েছে, ক্রমশ সত্য আপন মহিমায় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি অশ্রান্ত পদক্ষেপে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে সত্যের সন্ধানে এগিয়ে চলেছেন, অন্তরে সেই উপলব্ধির আনন্দে বলেছেন,

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে

দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আমার মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।"
(পনেরো—পত্রপুট)

সেই উপলব্ধির জোরেই মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রশান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি উচ্চারণ করেছেন যে তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে রচিত তাঁর শেষ কবিতাটিতে মূর্ত হয়েছে এই আত্মবিশ্বাস।"

" তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুন হাতে সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ, সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেরে সে পায়—
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।"

কবির সেই মৃত্যুহীন সাধনার কাহিনী তাঁর উত্তরসূরীদের যাত্রার পথকে আলোকিত করেছে।

॥ **সমাপ্ত** ॥